গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ৭ সংখ্যা ১৪ - ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ভোটের বাঁশি

প্রচার মাধ্যমে এখন জোর জল্পনা, কংগ্রেস কি লোকসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনে যাবে? যদি যায়, তবে কোন সময় কী কী বিষয় বিচার করে সে যাবে? কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম-তৃণমূল কোন দল কার সাথে জোট করবে, কে কেমন জোট বানালে নির্বাচনে ভাল সিট পেতে পারে, কোন দলের পক্ষে কোন সময়টা অনুকূল ইত্যাদি রকমারি হিসেব-নিকেশ যা ভোটকে সামনে রেখে প্রচার করা হয়ে থাকে, তার সবই অল্পবিস্তর বাজারে ছাড়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য হল ধীরে ধীরে ভোটের উত্তাপ ছড়িয়ে জনগণকে ভোটরঙ্গে মাতিয়ে দেওয়া।

ভোট ও জোট নিয়ে এই সব জল্পনা-কল্পনায় আমরা উৎসাহী নই। লোকসভার ভোট কবে হতে পারে তা নিয়ে ভবিষ্যদবাণী করাও আমাদের কাজ নয়। তবে ভোটের বাঁশিতে সামান্য ফুঁ পড়তেই দেশের ভোটবাজ দলগুলির যে নীতিহীন সুবিধাবাদী চরিত্র আবার উন্মোচিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে জনগণের সচেতন হওয়া দরকার।

গত ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের এক সভায় তৃণমূল নেত্রীর মুখে আপাতত কোনও জোটে না থাকার ঘোষণা, আবার ঐ দিনই দিল্লি পৌঁছে নেত্রীর মুখেই এন ডি এ না ছাড়ার ঘোষণা অতি বড় তৃণমূল সমর্থককেও অস্বস্তিতে ফেলে দেবে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সঙ্গে নেই, কিন্তু এন ডি এ-তে আছি, এ কথা বলার দ্বারা তৃণমূল নেত্রী তাঁর দলের রাজনৈতিক চরিত্রের যে দৃষ্টান্ত রাখলেন, তাকে ভোটসর্বস্ব একটি দলের চরম সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে 'আপাতত কোনও জোটে নেই' এই ঘোষণাটির জন্য তাঁর মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের সভামঞ্চটি বেছে নেওয়া থেকেই পরিষ্কার যে তিনি সংখ্যালঘু ভোটারদের মন পেতেই এটি বলেছেন। ৮ সেপ্টেম্বর আলিগড়ে গিয়ে একইভাবে তিনি বলেছেন, তিনি '৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং এখন আবার তিনি মহারাষ্ট্রে '৯৩ সালের দাঙ্গার উপর শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে কার্যকর করারও পক্ষে। এই রিপোর্টে দাঙ্গার জন্য শিবসেনা-বিজেপিকে সরাসরি দায়ী করা হয়েছিল। বোঝাই যায়, তিনি নানাভাবে বোঝাতে চাইছেন, তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপির সাথে নেই। অথচ ঘটনা হল, বাবরি মসজিদ ধ্বংস কিংবা মহারাষ্ট্রের দাঙ্গা যখন ঘটেছিল তখন জনগণ কোথাও তৃণমূল নেত্রীকে প্রতিবাদে দেখতে পায়নি। তৃণমূল নেত্রী তখন বাজপেয়ী আদবানির অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। ২০০১ সালে কেন্দ্রে যখন বিজেপি-তৃণমূল জোটের সরকার তখন

আটের পাতায় দেখুন

বঙ্গোপসাগরে যৌথ মহড়া
এশীয় ন্যাটোর ইঙ্গিত !

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এসেছিল কুখ্যাত মার্কিন নৌবহরের কুখ্যাত যুদ্ধজাহাজ নিমিৎস, যে জাহাজ পারস্য উপসাগর থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, যে জাহাজের ডেক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে বোমারু বিমান ইরাকের শহর, বসতি, হাসপাতাল, সড়ক, সেতু ধ্বংস করেছে, নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ইরাকীদের হত্যা করেছে। উপকূলে আরও এসেছিল পরমাণু শক্তি চালিত মার্কিন অতিকায় যুদ্ধ জাহাজ কিটি হক সহ ৫টি দেশের যুদ্ধ জাহাজ, একটি নিউক্লিয়ার সাবমেরিন ও ২০০ যুদ্ধবিমান। মার্কিন নৌবহরের সাথে মহড়ায় অংশ নিয়েছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাপানের নৌসেনা। ভারতকে জড়িয়ে পাঁচটি রাষ্ট্রের এতবড় আকারের নকল যুদ্ধ প্রদর্শনী অতীতে আর হয়নি। এই মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'মালাবার ০৭-০২' মহড়া। ৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই মহড়ায় কেবল যে যার দেশের সামরিক শক্তি দেখিয়েছে তাই নয়, ভারতীয় সেনাদের শেখানো হয়েছে, কীভাবে মার্কিন সেনাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে হয়। এজন্য আমেরিকার তৈরি একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর, অর্থাৎ সাধারণ কর্মকৌশল প্রক্রিয়া ভারত মেনে নিয়েছে। এ প্রশ্নে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এই বিশেষ কর্মকৌশল প্রক্রিয়াটি 'ন্যাটো'র ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের ডেক থেকে উড়ে যাচ্ছিল মার্কিন বোমারু বিমান এফ ১৬, আর ভারতীয় যুদ্ধবিমান সি হ্যারিয়ার ভারতীয় জাহাজ থেকে উড়ে মাঝ আকাশে মার্কিন বিমানে তেল ভরে দিচ্ছিল। এই মার্কিন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা ভারতের মিলিটারির পক্ষে একটা গুরুতর পরিবর্তন। যেহেতু ভারতীয় বাহিনী রুশ অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাই মার্কিন দোসর হতে গেলে অভ্যাসের বদলটা জরুরি। এই মহড়া সেই কাজটা করছে। এই মহড়ায় শেখানো হয়েছে, প্রকৃত যুদ্ধের সময় ভারতীয় বাহিনী কীভাবে আমেরিকা সহ অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্রগুলির সাথে একযোগে যুদ্ধ করবে, একে অপরকে সাহায্য করবে।

পরমাণু শক্তি চালিত মার্কিন যুদ্ধজাহাজ 'কিটি হক'

এভাবে যুদ্ধ মহড়ার টার্গেট কোন্ দেশ বা কারা? চীনের সরকার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে — এ হচ্ছে ইউরোপের মতো এশিয়াতেও মার্কিন নেতৃত্বে ন্যাটো সামরিক জোট গড়ে তোলার পথে পদক্ষেপ। যুদ্ধ মহড়ায় উপস্থিত মার্কিন সপ্তম নৌ বহরের কমান্ডার ভাইস অ্যাডমিরাল উইলিয়াম ডগলাস ক্রাউডার বলেছেন, চীনকে ভয় দেখানো বা চাপ দেওয়া (গানবোট ডিপ্লোমেসি) এই মহড়ার লক্ষ্য নয়। এ হচ্ছে মহড়ায় যুক্ত দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার লেনদেন করার একটা সুযোগ যেটা বহুমুখী আশঙ্কা বা হুমকির (মাল্টি থ্রেট) পরিবেশে খুব দরকার। প্রশ্ন হ'ল — এশিয়ায়, কে কোথায় কী আশঙ্কা সৃষ্টি করছে, বা যুদ্ধ হুমকি দিচ্ছে, যার জন্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

নয়াচরে কেমিকেল হাব ঃ নয়া বিপদ

কেমিকেল হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার নন্দীগ্রামে খুন-সন্ত্রাস-নারীধর্ষণের মতো নারকীয় কার্যকলাপ চালানোর পরে এখনও পর্যন্ত জনগণের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সামনে প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। হলদিয়াতে হাব তৈরির কথা ভাবা হয়েছিল। কখনও তারা বলেছে হাব নয়, হবে পেট্রোরসায়ন কারখানা — যা নাকি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা এস ই জেড নয়। বাক্‌নৈপুণ্যে বা সত্য গোপন করে সর্বৈব মিথ্যা বলার ক্ষমতায়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক তথ্যকেও চেপে যাওয়া বা বিকৃত করার ক্ষেত্রে প্রধান সরকারি দল সিপিএমের নেতাদের জুড়ি নেই। আসল কথা হল, বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষের বিরোধিতাই তাদের কেমিকেল হাবের জন্য নতুন নতুন ঠিকানা খুঁজতে বাধ্য করছে।

এবারের লক্ষ্য, মূল ভূখণ্ড ছেড়ে হলদিয়ার অদূরে হুগলি নদীর বুকে সম্প্রতি জেগে ওঠা বদ্বীপ নয়াচর। ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৭ কিলোমিটার চওড়া এই দ্বীপেই কেমিকেল হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা। কয়েকটি প্রচারমাধ্যম এটা কত সঠিক সিদ্ধান্ত, তার পক্ষে লিখেই চলেছে। অবশ্য ক'দিন আগে নন্দীগ্রাম বা পরে হলদিয়ার ক্ষেত্রেও মহারাজের পারিষদদের মতোই তারা 'ঠিক! ঠিক!' স্বর তুলে সমর্থন জানিয়েছিল। এখন এই নতুন স্থান নির্বাচন নিয়ে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন।

বছরের পর বছর পলি জমে জমে এক ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নদীর মোহনার কাছে এ ধরনের বদ্বীপের জন্ম হয়। যদি শেষপর্যন্ত পলি সঞ্চয়ের হার ক্ষয়ের চেয়ে বেশি হয়, তবেই অবশ্য এ'ধরনের দ্বীপ গড়ে উঠতে থাকে। এ এক গতিশীল প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে একদিন নতুন দ্বীপের জন্ম হয়, আবার তা একইভাবে ক্ষয় পেতে পেতে নদীর বুকে বিলীন হয়ে যেতেও পারে। বদ্বীপ গঠনের প্রক্রিয়া দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকে, যা বাধা পেলে দেখা দেয় নানা সমস্যা। উপরিতলের স্বাভাবিক গঠন বিপর্যস্ত হয়, নতুন ভূখণ্ডে নিকাশির সমস্যা দেখা দিতে পারে, বদ্বীপের তৈরি হওয়া আয়তন ক্রমে ক্রমে কমে যেতে পারে — এককথায় স্থায়িত্ব বিপর্যস্ত হতে পারে পুরো দ্বীপভূমির। নয়াচর এমনই এক নবীন অপরিণত বদ্বীপ, ভূমিগঠনের গতিশীল প্রক্রিয়া যেখানে অব্যাহত, চলবেও তা আরও বহুকাল। আবার স্বাভাবিকভাবেও একসময়ের গড়ে-ওঠা ও কিছুকাল স্থায়ী হওয়া বদ্বীপও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে নদীর গতিপ্রকৃতির জন্য। নয়াচরের দক্ষিণে সাগরদ্বীপের কাছে ঘোড়ামারা দ্বীপের কিছু জায়গা এমনিভাবেই ভেঙে যাচ্ছে, যেখানে উনিশ শতকে কিছু মানুষ বসবাস করতে শুরু করে। এই ধরনের ভাঙনের হাত থেকে দ্বীপভূমিকে রক্ষা করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এখনও মানুষের আয়ত্তে নেই। নদীর বিচিত্রগতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চেষ্টা চলছে বটে, তার ভিত্তিতে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ কখনও কখনও সম্ভব হলেও মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান এখনও সম্ভব হয়নি। আবার দেখা গেছে, নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার পরে যতটা রক্ষা পেল, তার চেয়েও আরও অনেক ক্ষতি অন্য জায়গাতে বা অন্য ক্ষেত্রে ঘটে যায়।

এই বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে নয়াচর দ্বীপে শিল্পকারখানা গড়ে তোলার বিষয়টি ভাবতে হবে। ১৯৬৮ সাল থেকে দ্বীপটি জলের ওপর মাথা তুলতে থাকে, যদিও তা বড় জোয়ারে পুরোপুরি ডুবে যেত। রিমোট সেনসিং ম্যাপ থেকে দেখা যায়, ১৯৯১ সাল নাগাদ এটি সম্পূর্ণ দ্বীপের চেহারা নিয়েছে। তাছাড়া ১৯৮৬ সালে ভারত সরকার যে পরিবেশ রক্ষা আইন তৈরি করে তার আওতায় কোস্টাল রেগুলেশন জোন নোটিফিকেশন জারি করে ১৯৯১ সালে, যার মধ্য দিয়ে সমুদ্রতট, অর্থাৎ জোয়ার-ভাটা খেলা এলাকা তথা এ ধরনের দ্বীপভূমি রক্ষা পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশ, মানুষের জীবনজীবিকা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কিছুটা হলেও বিজ্ঞানের নিয়মের ওপর ভিত্তি করেই এক রক্ষাকবচ তৈরি হয়। সেই আইন অনুসারে নয়াচর দ্বীপটি ১নং এলাকাভুক্ত, যা কোনোভাবেই কলকারখানা তো দূরের কথা,

আটের পাতায় দেখুন

কুলতলিতে জমি কেড়ে নেওয়ার আশঙ্কায় গণকনভেনশন

কুলতলি থানার ময়রারচক (ডোঙাজোড়া), দক্ষিণ গরাণকাঠি এলাকার ২০০০ একরেরও বেশি জমি বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ২৩ আগস্ট কুলতলি থানা পার্শ্বস্থ মাঠে এক গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে গরিব কৃষক, দলমত নির্বিশেষে প্রায় দু'হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন এই প্রতিবাদ সভায়। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

গ্রামে কাজের ক্ষেত্র খুবই সীমিত, অধিকাংশ মানুষের সারা বছরের কাজ নেই। ভয়াবহ বেকারি ও দারিদ্রকে সঙ্গী করেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলির মানুষও কোনরকমে বেঁচে আছেন। জেলার দক্ষিণ অংশ, অর্থাৎ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল চাষ ও বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য একদিন বাঘ, কুমির, সাপ ইত্যাদি বন্যজন্তু ও প্রবল প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করেই মানুষকে বাঁচতে হয়েছে। জঙ্গল সাফ করে জমি হাসিল করা এবং নোনা জলের হাত থেকে জমি রক্ষা করা এবং অন্যদিকে নদীর চরে জেগে ওঠা নতুন ভূখণ্ড বাসযোগ্য করে তোলার স্মৃতি, তথা এই অঞ্চলের মানুষের যূথবদ্ধ সংগ্রামের স্মৃতি আজও টাটকা হয়ে আছে। কৃষিজমিতে নিকাশির সমস্যা, বা নোনাজলের আক্রমণ ইত্যাদি আজও ঘটে থাকে, যা ব্রিটিশ আমলের থেকে খুব একটা আলাদা নয়। এর মধ্যেই সুন্দরবনের নদী-খাঁড়িতে মাছ ও মীন ধরে, ফিসারি তৈরি করে, জঙ্গল থেকে কাঠ-মধু সংগ্রহ করে, বা অন্য কোনও উপায়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম মানুষের নিত্যসঙ্গী।

ঠিক এমনই এক অঞ্চল হল কুলতলি থানার জামতলার কাছে ময়রার চক (ডোঙাজোড়া), দক্ষিণ গরাণকাঠি, কুন্দখালি, বালাহারানিয়া প্রমুখ মৌজা। এর মধ্যে ময়রারচক সাম্প্রতিক অতীতে জেগে ওঠা নদীর চর। এই চরটি সহ লাগোয়া মৌজাগুলির জনসংখ্যা বেশ কয়েক হাজার। এখানে প্রায় ৬০০০ বিঘা জমি অধিগ্রহণের কথা শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কয়েকবার সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদেশি বিশেষজ্ঞরাও ঘুরে গিয়েছেন। যতদূর জানা গেছে, এখানে তৈরি হতে যাচ্ছে বায়োডিজেল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গাছ ও বিশেষ ধরনের শৈবালের চাষ, যা দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে এনে দেবে কোটি কোটি টাকার মুনাফা। আর তার বিনিময়ে উচ্ছেদ হবে হাজার হাজার মানুষ — তাদের চাষবাস, রুটিরুজির শেষ সম্বলটুকু সমেত। যা উৎপন্ন হবে তার ব্যবহার, এখনকার মানুষের কাছে কল্পনার বস্তু হিসেবেই থেকে যাবে।

শাসক সিপিআই(এম) দলের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর প্রচার সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাধারণ সমর্থক, এমনকী শাসকফ্রন্টের দলীয় নেতারাও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন ও বক্তব্য রাখেন। এই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক এস ইউ সি আই'র জেলা নেতা কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার এবং প্রদীপ হালদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির ড. শুভাশিস মাইতি। সভায় সকল বক্তাই সরকারি গোপনীয়তার তীব্র সমালোচনা করে হাজার হাজার মানুষের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার দিকে যাতে সরকার ঠেলে দিতে না পারে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে তার জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই পরিকল্পনায় যে দু'টি নদী বেঁধে ফেলা এবং কয়েকটি স্লুইস গেট বন্ধ করার কথা আছে, যা কিনা স্থানীয় অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থায় অবধারিতভাবে প্রভাব ফেলবে এবং ৬০০০ বিঘা জায়গা জুড়ে এতবড় পরিকল্পনা পরিবেশের ওপর যে সার্বিক প্রতিক্রিয়া ঘটাবে, সেইসব বৈজ্ঞানিক দিকগুলি নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

কনভেনশন থেকে ময়রারচক, দক্ষিণ গরাণকাঠি ও কুন্দখালি বাস্তু ও ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি তৈরি হয়। অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি ভোলানাথ মণ্ডল, সভাপতি ও স্থানীয় সংগঠক শঙ্কর নস্কর, সম্পাদক নির্বাচিত হন।

অ্যাবেকা

হুগলি জেলা ধিক্কার সপ্তাহ

সাধারণ মানুষের বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে বৃহৎ শিল্পপতিদের ভরতুকি দেওয়ার বিরুদ্ধে, কৃষিতে ৫০ পয়সা এবং গৃহস্থ সহ ক্ষুদ্রব্যবসা ও ক্ষুদ্র- শিল্পে ১ টাকা দরে বিদ্যুতের দাবিতে ১৬ আগস্ট থেকে ২৩ আগস্ট সারা রাজ্যের সঙ্গে হুগলি জেলার বিভিন্ন থানায় পথসভা, সই সংগ্রহ, বিক্ষোভ-ডেপুটেশন-ঘেরাওয়ের মধ্য দিয়ে ধিক্কার সপ্তাহ পালন করা হয়। জেলার পাণ্ডুয়া, খন্যান, সিঙ্গুর, চাঁপাডাঙা, মগরা, ধনেখালি, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, আরামবাগ, গোঘাট প্রভৃতি গ্রুপ সাপ্লাই অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। সর্বত্র ডেপুটেশনে জেলা ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও শত শত সাধারণ গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন।

আন্দোলনে দাবি আদায়

মগরা থানার দিগসুই পঞ্চায়েতের অধীন মাঝেরপাড়া গ্রামে ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘদিন পাল্টানো হয়নি। ফলে চাষ-আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ট্রান্সফরমার পাল্টানোর দাবিতে ২৩ আগস্ট ২ শতাধিক গ্রামবাসী অ্যাবেকার নেতৃত্বে মগরা সাপ্লাই অফিস ঘেরাও করে। পুলিশ আসে কিন্তু ক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভের সামনে পিছু হটতে বাধ্য হয়। থানা কমিটির পক্ষে মহিউদ্দিন মোল্লা এবং অমিত ঘোষ ডিভিশনাল ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ডিভিশনাল ম্যানেজার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ট্রান্সফরমার লাগিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পরদিন দুপুরের মধ্যে ট্রান্সফরমার পাল্টে দেওয়া হয়।

গোঘাট থানা সম্মেলন

২ সেপ্টেম্বর গোঘাট থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক স্কুলে। সভাপতিত্ব করেন হুগলি জেলা কমিটির সদস্য এবং আরামবাগ মহকুমা ইনচার্জ প্রবীর ভক্ত। সম্পাদকীয় বক্তব্য রাখেন সাদেক আলি। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিক্ষক গৌরমোহন মাজি এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তপন চক্রবর্তী। মণ্টু গায়েনকে সভাপতি এবং সাদেক আলিকে সম্পাদক করে ২৫ জনের থানা কমিটি গঠিত হয়।

কোলাঘাট স্টেশনের উন্নয়নের দাবিতে গণডেপুটেশন

স্টেশনের তিনটি প্ল্যাটফর্মে শৌচাগার নির্মাণ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য অব্যবস্থা দূর করার দাবিতে নিত্যযাত্রীদের পক্ষ থেকে ২৫ আগস্ট স্টেশন মাস্টারের কাছে গণস্বাক্ষর সহ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনি অভিযোগগুলি স্বীকার করে যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অরূপ মণ্ডল, মহাদেব দাস, গোবিন্দ ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ বেরা, সৌমেন্দ্র পাণ্ডু, বংশী মাইতি, শীতল মাইতি প্রমুখ।

ঘাটালে বন্যাত্রাণে বিজ্ঞান সংগঠন

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করেছে। বহু জায়গায় এ নিয়ে তিনবার বন্যা হয়েছে, বহু অসহায় মানুষের কাছে সরকারি তরফে কোনও ত্রাণসামগ্রী পৌঁছায়নি। বিশিষ্ট বিজ্ঞান সংগঠন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির খড়্গপুর আই আই টি চ্যাপ্টারের উদ্যোগে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের একটি দল ২৬ আগস্ট ঘাটাল মহকুমার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে নৌকায় গিয়ে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। এই মুহূর্তে দুর্গম স্থানগুলি হচ্ছে, আজবনগর-২ পঞ্চায়েতের অধীন নিমপাতা, মহারাজপুর, এলোচক, ভাঙাদহ, পান্না ইত্যাদি গ্রাম। আই আই টি-র বিজ্ঞানী অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্ররা খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ২৫০০০ টাকা সংগ্রহ করে মিল্ক পাউডার, চিনি, চিঁড়ে, জিওলিন ইত্যাদি ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেন দুর্গতদের হাতে। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন ঘাটাল সায়েন্স সোসাইটির সদস্যবৃন্দ।

রঘুনাথপুর কলেজে এস এফ আই-এর গুণ্ডামির প্রতিবাদে ধর্মঘট

এ আই ডি এস ও পরিচালিত পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর কলেজ ছাত্র সংসদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে এস এফ আই-এর মদ্যপ গুণ্ডাবাহিনী তাণ্ডব চালালো গত ২৯ আগস্ট।

এস এফ আই-টি এম সি পি'র দুর্নীতি ও গুণ্ডাবাজির বিরুদ্ধে এবং কলেজের বিভিন্ন দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ বছর এ আই ডি এস ও বিপুল ভোটে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়। এ আই ডি এস ও'র ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ঐ সংগঠনগুলিকে ক্রমেই আতঙ্কিত করে তুলেছে। ফলে সংসদের কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, বাধাদান করার প্রচেষ্টা নানাভাবে তারা চালিয়ে যাচ্ছে।

নবীনবরণের দিন এস এফ আই-এর নেতৃত্বে একদল মস্তান মদ্যপ অবস্থায় অশালীন গালিগালাজ, কুৎসিত নৃত্য শুরু করে অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিতে চায়। বাধা দিতে গেলে তারা সাংস্কৃতিক সম্পাদক তন্ময় সূত্রধর ও ক্রীড়া সম্পাদক মধুসূদন মুখার্জী সহ সাধারণ ছাত্রদের মারতে শুরু করে। অধ্যক্ষ ও অন্যান্য অধ্যাপক, অশিক্ষক কর্মচারীরা বাধা দিতে গেলে এস এফ আই-এর মাতাল নেতারা তাদের গায়েও হাত তোলে। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে নবীনবরণের কর্মসূচী বন্ধ করে দিতে হয়।

এস এফ আই-এর গুণ্ডামির প্রতিবাদে ঐদিন রঘুনাথপুরে শহরে ৩০ আগস্ট জেলাব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের এবং রঘুনাথপুর কলেজ ছাত্র ধর্মঘটের মাইক প্রচার শুরু হয়, ব্যাপকভাবে বিলি হয় প্রচারপত্র।

সর্বাত্মক ধর্মঘটের চাপে এবং সাধারণ ছাত্রদের দাবি মেনে নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ এস এফ আই-এর দোষী নেতাদের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে।

কলেজের পূর্বতন ছাত্র সংসদের সদস্যরাও এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। পূর্বতন ছাত্র সংসদের দুই সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে অভিভাবক ও ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি দেন।

নদিয়ায় পথ অবরোধ

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি প্রবেশের প্রতিবাদে সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবসে ২২ আগস্ট কৃষ্ণনগর ও বেথুয়াডহরীতে এক ঘণ্টার পথ অবরোধ এবং করিমপুর ও পলাশীপাড়াতে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পথ অবরোধে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড হররোজ আলী সেখ সহ জয়দীপ চৌধুরী, বরুণা দাশগুপ্ত, কামালউদ্দিন ও সেকেন্দার আলী প্রমুখ। পুলিশ পথ অবরোধগুলি জোর করে তুলে দিতে চাইলেও জনসমর্থনের কারণে তা পারেনি।

বাঁশবেড়িয়া জুট-শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের শত শত শ্রমিক সকলপ্রকার সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। সংগঠিত শিল্পে ইএসআই, প্রভিডেন্ট ফান্ড সহ ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্টের সকল সুযোগসুবিধা শ্রমিকদের আইনত প্রাপ্য। পশ্চিমবঙ্গে ৩০ বছরের সিপিএম সরকার চটশিল্পের মালিকদের ঢালাও মদত দেওয়ার জন্য আজ মালিকরা শ্রমিকদের আইনত প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট লঙ্ঘনকারী মালিকদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। আজ যখন অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে শিল্প-বান্ধব মুখ্যমন্ত্রীর দলের শ্রমিক সংগঠন সিটু ৮ আগস্ট একদিনের ধর্মঘট করে শ্রমিকদের ঠকাচ্ছে, তখনই সংগঠিত শিল্পে হাজার হাজার শ্রমিককে আইনগত সকল সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে যে সকল মালিকরা, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পূর্ণ মদত দিয়ে চলেছেন।

এছাড়া বাঁশবেড়িয়ায় সিপিএম, সিপিআই, কংগেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি পরিচালিত ইউনিয়নগুলির প্রত্যক্ষ মদতে হাজার হাজার শ্রমিক সকল প্রকার সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। এই বঞ্চিত শ্রমিকদেরই একটি বড় অংশ কয়েকশত মহিলা শ্রমিক এবং সিটু ইউনিয়নের কয়েকজন নেতা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীতে যোগদান করেন। ৩০ আগস্ট ই এস আই-র রিজিওনাল ডিরেক্টরের কলকাতার মুখ্য কার্যালয়ে শতাধিক মহিলা সহ কয়েকশত শ্রমিক বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীদের বিক্ষোভের সামনে বাধ্য হয়ে ই এস আই কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর বর্ষীয়ান নেতা কমরেড সনৎ দত্ত, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, বাঁশবেড়িয়ার শ্রমিকনেতা অযোধ্যা মাহাতো, বি ভাস্কর রাও এবং মহিলা নেত্রী ভাগীরথী রাও, এ চন্দ্রকলা রাও, স্বাতী রায়, অনীতাদেবী সাউ, আরতি দাস। উল্লেখ্য ২০ জুন '০১ চটশ্রমিকদের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ সোমেশ্বর রাও-এর মা ভাগীরথী রাও সংগ্রামী আন্দোলনের ধারা বহন করে চটশ্রমিকদের আন্দোলনের দায়িত্ব নিয়ে আজ এগিয়ে এসে এই বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়েছেন।

অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার এত বাড়ছে কেন

নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল ১৮ বছরের তরুণী মনজিতকে, পাঞ্জাবের জলন্ধরে। পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও সে এক তরুণের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল — এই ছিল তার অপরাধ।

মধ্যযুগে নয়, এ ঘটনা ঘটেছে গত বছরের জুন মাসে। হত্যাকারী সেই অন্ধকার যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনও মানুষ নন, মনজিতের নিজেরই বড় ভাই। এ'বছরের ২ জুলাইও এরকম করুণ মৃত্যুর শিকার হতে হয়েছে এক নবদম্পতিকে — হরিয়ানার কাইথাল জেলায়। গ্রাম ও পরিবারের কর্তাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে, একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ করেছিল মনোজ ও বাবলি। এই 'অপরাধে'র শাস্তি হিসাবে তাদের আত্মীয়রা কীটনাশক খেতে বাধ্য করে মনোজ-বাবলিকে। মৃতদেহগুলি তারা ভাসিয়ে দেয় ক্যানেলের জলে। এহেন নৃশংসতার পরেও ঐ হত্যাকারীরা কিন্তু বুঝতেই পারেনি যে তারা অপরাধ করেছে। বলেছে — সমাজের পাপ দূর করার জন্যই এ কাজ তারা করেছে। কাইথালে মনোজের পরিবারকেও তারা একঘরে করে রেখেছে।

ধর্মীয় এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের নজির এইসব ঘটনা গোটা দেশজুড়ে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। সংবাদমাধ্যমে তার যেটুকু প্রকাশিত হয়, তা এক-শতাংশও নয়। এমনকী শিক্ষার ক্ষেত্রে একসময়ে প্রথম সারিতে থাকা যে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক চেতনা ও কুসংস্কারমুক্ত উদার মানসিকতার জন্য গোটা ভারতবর্ষের মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, সেখানেও আজ প্রতিনিয়ত জাত-পাত-ধর্মকে কেন্দ্র করে বর্বরতা-নৃশংসতার বহু নজির সৃষ্টি হচ্ছে। বর্ধমানের কালনার এক তরুণ, বিকাশ মাঝি ভিন্ন ধর্মের একটি মেয়েকে বিবাহ করায় তাঁর পরিবারের ওপর সমাজের স্বঘোষিত রক্ষকদের আক্রোশের খাঁড়া নেমে এসেছে। পরিবারটিকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে। স্ত্রী সহ বিকাশ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিকাশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ তুলে তাঁর মাকে মারধোর করে ঘর থেকে বের করে দিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়েছে এলাকার কিছু মানুষ।

মুর্শিদাবাদের স্কুলশিক্ষিকা তনিমা সাহা ভিন্ন ধর্মের এক স্কুলশিক্ষককে বিবাহ করেছেন বলে তাঁকে স্কুলে এসে ক্লাস নিতে বাধা দিয়েছিল স্থানীয় একদল যুবক। এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দূরে থাক, তনিমা দেবীর স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে স্কুলের পরিবেশ রক্ষার অজুহাত দেখিয়ে ক্লাস না নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন।

গোসাবার প্রাথমিক স্কুলশিক্ষক মদনমোহন মণ্ডল বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ধর্মাচরণ করেননি। এই 'অপরাধে'র জন্য যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে দীর্ঘদিন স্কুলে ঢুকতে দেননি। লোকদেখানো ভণ্ডামি না করে ধর্মাচরণ সংক্রান্ত নিজস্ব উপলব্ধিকে জীবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে মদনমোহনবাবুকে আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি দুই-ই স্বীকার করতে হয়েছে।

এভাবেই অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ফাঁদে পা দিয়ে কোথাও অসুখ-বিসুখে সঠিক ওষুধ না দিয়ে ওঝা ও ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নিচ্ছে মানুষ, কোথাও 'ডাইনি' অপবাদ দিয়ে অসহায় মহিলাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে, কোথাও অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার অপরাধে গৃহবধূর মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার বিধান দিচ্ছে সমাজপতিরা, আবার কোথাও নিম্নবর্ণের মেয়েরা মিড ডে মিলের রান্নার দায়িত্বে রয়েছেন বলে অভিভাবকরা নিজেদের সন্তানদের সেই মিল খেতে দিচ্ছেন না। এ জিনিস প্রায়ই ঘটছে পশ্চিমবঙ্গেও — যেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ ছিল অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম।

শুধু গ্রামীণ ভারত বা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষ এই ধরনের যুক্তিহীন কুসংস্কারগ্রস্ত মন নিয়ে চলেন তা নয়, উচ্চশিক্ষিত এবং শহরে বসবাসকারী অসংখ্য মানুষ, যাঁদের অনেকে এমনকী বিজ্ঞান এবং উচ্চপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ-কারবার করেন, তাঁরাও দিনে দিনে অন্ধবিশ্বাস ও যুক্তিহীনতার শিকার হয়ে পড়ছেন। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ধর্ম ও কুসংস্কারমুখী হয়ে পড়ার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে শহরের শিক্ষিত সমাজেই। সমীক্ষাটিতে বলা হয়েছে, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে এদেশের ৪৬ শতাংশ মানুষ, নিয়মিত জ্যোতিষীর কাছে যায় ২৪ শতাংশ, পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে ৪৪ শতাংশ এবং স্বর্গ-নরক তত্ত্বে বিশ্বাস করে ৫৭ শতাংশ মানুষ (সূত্রঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৪-২-০৭)।

বস্তুত, আজকের দিনে যখন টাকার অঙ্কে দেশের জাতীয় আয় বাড়ছে, নেতা-মন্ত্রীরা দিবারাত্র 'উন্নয়নে'র ঢাক পেটাচ্ছেন এবং শহরগুলি সেজে উঠছে শপিং মল, ফ্লাইওভার আর মাল্টিপ্লেক্সে, তখন একইসঙ্গে রাস্তার মোড়ে, অলিতে-গলিতে গজিয়ে উঠছে অসংখ্য ধর্মস্থান। ঝকঝকে চেহারার তরুণ-তরুণীদের চূড়ান্ত আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে নবগ্রহকে সন্তুষ্ট রাখার তাগা-কবচ-মাদুলি। যে হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে বিশ্বের আধুনিকতম মোবাইল ফোন, সেই হাতেরই কব্জিতে বাঁধা বিপত্তারিণীর লাল সুতার ডোর।

কিন্তু কেন এই চিন্তার দৈন্য? কীসের আশঙ্কায়, অথবা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন্ আশায় এই একবিংশ শতাব্দীতে, ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি পলে বিজ্ঞান ব্যবহার করা মানুষ অবৈজ্ঞানিক, যুক্তিহীন ও মনগড়া নানা তত্ত্বে বিশ্বাস করে কুসংস্কারগ্রস্ত হয়ে পড়ছে? সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের কবলে পড়ে খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন আজ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যে জর্জরিত হয়ে রয়েছে। আজ দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের সংস্থান করা তাদের পক্ষে দুরূহ বিষয়, চিকিৎসা ব্যবস্থা পণ্যে পরিণত হওয়ার ফলে অসুখে ওষুধ জোটানো দুষ্কর, সন্তানদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা আকাশের চাঁদ ধরার সামিল। দেশে নতুন কলকারখানা গড়ে উঠছে না বললেই চলে। গোটা দেশজুড়ে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেকোন মুহূর্তে মাথার ওপরে ছাঁটাইয়ের খড়্গ নেমে আসার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে শ্রমিক। বেকারত্বের সমস্যা আজ তীব্র আকার নিয়েছে, যা শুধু নতুন করে অধিকতর দারিদ্র্যের জন্ম দিচ্ছে তাই নয়, সমস্ত সমাজ জুড়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। এই ভয়ানক দুর্দশা ও প্রতিমুহূর্তের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার অলীক আশায় অসহায় শ্রমজীবী মানুষ যথার্থ শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে আজ অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের হাতে আত্মসমর্পণ করে দু'দণ্ডের শান্তির সন্ধান করছে।

অন্যদিকে ধনীরা, এই হতদরিদ্র, নিঃসহায় মানুষগুলির বিপরীতে অবস্থান করলেও, তাদের জীবনও আজ অনিশ্চয়তা ও অশান্তির ভারে দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক জগতে নীতিহীন প্রবল প্রতিযোগিতার সামনে পড়ে এই ধনী মানুষগুলির জীবনের প্রতিটি ক্ষণ আজ দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। যাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে কাজ করছেন, প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে অন্যের তুলনায় যোগ্যতর হিসাবে জাহির করার দৌড়ে সামিল হয়ে শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও তাঁরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন। অর্থের অভাব না থাকলেও পাগলা নোংরা পুঁজিবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে এইসব ধনী মানুষগুলির অধিকাংশেরই ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আজ শান্তির চূড়ান্ত অভাব। বাবা-মায়ের সাথে সন্তানদের, স্বামীর সাথে স্ত্রীর এবং সামগ্রিকভাবে পরিবারের সদস্যদের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি হয়ে পড়েছে ঠুনকো, অন্তঃসারশূন্য, অনেক ক্ষেত্রেই বিষাক্ত। ধনীসমাজের এই সামগ্রিক অবক্ষয়ের কারণে এদের মধ্যে মানসিক রোগের প্রকোপ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় দিশা হারিয়ে এইসব মানুষও জ্যোতিষী, ধর্মগুরু, ভগবান-আল্লার কাছে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করছে।

অথচ একদিন সমস্ত কুসংস্কার এবং ধর্মের দাপটের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল যুক্তি এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা। ইউরোপে পঞ্চদশ শতকে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির গর্ভে তখন জন্ম নিয়েছে বণিকী পুঁজি। যন্ত্রের আবিষ্কারের সাথে সাথে যখন সমাজে বিপুল উৎপাদিকা শক্তি গড়ে উঠল। তখন দেখা গেল, প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক বজায় থাকলে সেই শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ফলে, সামন্ততন্ত্রের গর্ভে জন্ম নেওয়া নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের ডাক দিয়েছিল। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সেই প্রথম যুগে অসংখ্য কলকারখানা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। সেখানে কাজ করবার জন্য বহুসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষ ভূমিদাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকায় বিকাশমান বুর্জোয়ারা, শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাবার জন্য ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ করার আহ্বান জানিয়েছিল। সমাজে সেইসময় প্রবল প্রতাপ নিয়ে বিরাজ করত চার্চের যাজক ও সামন্তপ্রভু, তথা রাজারা। এরা নিজেদের ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে প্রচার করে সাধারণ মানুষের ওপর অবাধে শোষণ-উৎপীড়ন চালাত। সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করতে গিয়ে উদীয়মান বুর্জোয়াদের সর্বপ্রথম এইসব ধর্মযাজক ও রাজাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছিল। সেই প্রয়োজন থেকেই তারা সমস্ত অতিপ্রাকৃত সত্তা সহ খোদ ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ; ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্লোগান তুলেছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সমাজেও সৃষ্টি হয়েছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার আকুতি, গড়ে উঠেছিল মানবতাবাদী মূল্যবোধ। মানুষকে কেন্দ্র করে, মানুষের প্রয়োজনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই মূল্যবোধ প্রকৃতি-বহির্ভূত সমস্ত সত্তার অস্তিত্বের অস্বীকৃতির পথে চার্চ ও ধর্মগুরুদের প্রবল আধিপত্যের বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

পুঁজিবাদের বিকাশের সেই যুগে প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ইউরোপের সমাজে বিজ্ঞানচেতনারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। কারণ পুঁজিবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের বিকাশ ঘটাতে তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ও নতুন নতুন যান্ত্রিক আবিষ্কারের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ফলে শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। সমাজেও তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। নারীস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গান গাইতে গাইতে মানুষ সেদিন যুক্তির ভিত্তিতে বিচার করা ও প্রতিটি ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল, ছিঁড়ে ফেলেছিল কুসংস্কারের জাল। সূত্রপাত হয়েছিল রেনেসাঁস বা নবজাগরণের চিন্তাধারার।

ইউরোপের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে ভারতেও বণিকী পুঁজির ব্যাপক বিকাশ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার আগেই এদেশের বণিকী পুঁজি দেশের মাটিতেই বিদেশি পুঁজি, বিশেষত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকী পুঁজির প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং তার বিকাশ ব্যাহত হয়। এরপর সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়াতেই ভারতের জাতীয় পুঁজির বিকাশ ঘটতে শুরু করে এমন একটা সময়ে, যখন গোটা বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদ তার অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। এই কারণে ইউরোপের দেশগুলির মতো সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকাশের পরিবর্তে ভারতীয় পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে সামন্তী সমাজের সঙ্গে আপস করে। সমাজ মননেও তাই স্তরে স্তরে থেকে গেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন সামন্তী চিন্তাভাবনা; কুসংস্কার ও অতিপ্রাকৃত সত্তার প্রতি যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস।

তবে ধর্মনিরপেক্ষ ও বলিষ্ঠ মানবতাবাদী মূল্যবোধ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা থাকার দরুন প্রকৃতিবহির্ভূত সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিঁড়ে ফেলার জন্য গোটা সমাজ জুড়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে না উঠলেও আঠারো-উনিশ শতকে এদেশেও রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে নবজাগরণ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। ধর্মসংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে এই আন্দোলন শুরু হলেও এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে ইউরোপের রেনেসাঁসের মতো যুক্তিবাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ, কার্য-কারণ সম্পর্ক বিচারের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ মনোভাব এবং মানবকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার মতো বিষয়গুলি এসে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারতীয় রেনেসাঁসের এই চিন্তাধারার গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ধর্মীয় ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যুক্তি, পরীক্ষিত সত্য ও বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল সমাজমানস গড়ে তোলার জন্য আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। যদিও শেষপর্যন্ত এই ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী মূল্যবোধ এদেশের সমাজচেতনার মূল ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, ভারতবর্ষের আপসমুখী জাতীয় পুঁজির মদতে সেই জায়গা দখল করেছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা। শোষণমূলক চরিত্রের কারণে এবং ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিকভাবে সংকটগ্রস্ত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করার দরুন পুঁজিবাদ ভারতে তার বিকাশের যুগে নির্বিঘ্নে শোষণ চালানোর জন্য সমাজ থেকে যুক্তিবাদ মুছে দিয়ে সাধারণ মানুষকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে ডুবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। কারণ তাদের ভয় ছিল যুক্তিবাদকে অবাধ করলে তা শ্রমিকবিপ্লব ডেকে আনবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এদেশে যে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার মূল ধারার নেতৃত্বে ছিল ভারতের জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী। স্বভাবতই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠার পরিবর্তে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হয়ে পড়েছিল মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদ। সেইসময় ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ধারা হিসাবে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেতৃত্বে জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সর্বপ্রকার সাহায্য নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা শুধু আপসমুখী ও সংস্কারপন্থী ছিল তাই নয়, তাও গড়ে উঠেছিল মূলত হিন্দুধর্মকে ভিত্তি করেই। শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে নয়, আপসের পথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা

পাঁচের পাতায় দেখুন

শিল্পায়ন হবে? শিল্পপণ্য কিনবে কারা?

গণদাবীর পাঠকরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, এ রাজ্যে সিপিএম বা অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেস-বিজেপি'র মতো দলগুলো 'শিল্পায়ন' 'শিল্পায়ন' বলে যে প্রচার তুলছে, 'বেকারদের জন্য শিল্প চাই' বলে যে স্লোগান দিচ্ছে, আমরা তাকে ছলনা বা ধাপ্পা বলেছি। তাছাড়া, সিপিএমের জায়গায় অন্য দল বসলে তারা শিল্পায়ন করতে পারবে বলে যেকথা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলি বলে থাকে, আমরা সেকথাও বলিনি।

আমরা নানাভাবে বারবার একথাই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশে চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করার জন্য যে শিল্পায়নের প্রয়োজন, যেটা না হলে দেশের মানুষের খাওয়া-পরা-আশ্রয়ের সমস্যার সমাধান হতে পারে না, সেই শিল্পায়ন ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। এই উৎপাদন ব্যবস্থা আজ দেশের ৮০ শতাংশ সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে এমন ঘোরতর সঙ্কট তৈরি করেছে যে, সাধারণ মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্যগুলি কিনবার মতো আর্থিক ক্ষমতা দেশের অধিকাংশ মানুষের নেই।

কেন দেশের অধিকাংশ মানুষের শিল্পপণ্য কেনার ক্ষমতা নেই

কেন এই অবস্থা দেশে সৃষ্টি হল? কারণ, এই উৎপাদন ব্যবস্থাটাকে বলা হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা — ক্রমাগত বেশি বেশি মুনাফা, যাতে মালিকের পুঁজির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এই মুনাফা শিল্পপতিরা বা পুঁজিপতিরা পকেটে পুরতে পারে কেবলমাত্র শ্রমিককে ক্রমাগত বেশি মাত্রায় শোষণ করে। এই শোষণ পুঁজিবাদে দু'রকমভাবে হয়। একটা হচ্ছে কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে — অর্থাৎ, একজন শ্রমিক যা মজুরি পায়, তাতে ৪ ঘণ্টার উৎপাদন করলেই সেই পরিমাণ মজুরি উঠে যায়, কিন্তু তাকে কাজ করিয়ে নেওয়া হয় ৮, ১০, ১২ ঘণ্টা। এই যে বাকি ৪-৬-৮ ঘণ্টার উৎপাদন, তার জন্য কোনও মজুরি শ্রমিক পায় না। এটা মালিকের মুনাফা হয়ে পকেটে যায়, পুঁজির বৃদ্ধি ঘটায়।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো। এতে কাজের সময় বা ঘণ্টা একই থাকবে, কিন্তু আগে এই যন্ত্র ছাড়া শ্রমিক ১ ঘণ্টায় যা উৎপাদন করত, এখন যন্ত্র দিয়ে ১ ঘণ্টায় তার দ্বিগুণ উৎপাদন করে। অর্থাৎ, শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা যায় বেড়ে। এর দ্বারা হয়তো দেখা যাবে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে ২ ঘণ্টা কাজ করলেই শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি উসুল হয়ে যায়। অথচ শ্রমিকের কাজের ঘণ্টা একই থাকে। ফলে শ্রমিকের একই কাজের ঘণ্টার মধ্যে মালিকের মুনাফা অনেক বেড়ে যায়। সামগ্রিকভাবে দেখলে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া উৎপাদন করতে কারখানায় যত শ্রমিক প্রয়োজন হয়, যন্ত্রপাতি দিয়ে উৎপাদন করালে তার চেয়ে অনেক কম শ্রমিক প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য পুঁজিপতিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাওয়ার আসল কারণ এটাই। সকলেই চাইছে, উৎপাদনের খরচ কমিয়ে লাভের অঙ্ক বাড়াতে। এটা কোনও একজন পুঁজিপতির ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় নয়। আধুনিক প্রযুক্তি এসে গেলে, তা ব্যবহার করে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে উৎপাদন ব্যয় কমাতে যে পুঁজিপতি ব্যর্থ হবে, তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার অন্য পুঁজিপতি দখল করে নেবে। এটাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম।

এই নিয়মের পরিণামটা সমাজের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে? আধুনিক প্রযুক্তি এসে যাওয়ার ফলে মালিকরা আরও কম শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন করাতে চায়, শ্রমিকদের 'বাড়তি' ঘোষণা করে আরও ছাঁটাই করে দেয়, যেমন খুশি ছাঁটাই করতে পারার অধিকার দাবি করে, যেমনটা ভারতে করছে। ২/৪টা কলকারখানা যা হচ্ছে তাতে শ্রমিক লাগছে কম, ফলে বেকার তৈরি হচ্ছে ব্যাপক হারে। দেশের ২০০টি বড় বড় কোম্পানির আয়-ব্যয়ের উপর সমীক্ষার একটি রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, এক ইউনিট বাড়তি উৎপাদন করতে আগে যে পরিমাণ পুঁজির দরকার হত, এখন তার চেয়ে কম পুঁজি লাগছে। পুঁজিপতিদের ব্যাখ্যায়, এর দ্বারা পুঁজির দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রমাণ হয়। আসলে এর দ্বারা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধিই প্রমাণিত হয়। অথচ শ্রমিকদের মজুরিবাবদ মালিকের ব্যয় কীরকম হচ্ছে? সমীক্ষা বলছে ১ টাকা মূল্যের বাড়তি উৎপাদনের জন্য মালিকরা মজুরিবাবদ ব্যয় করছে ৯ পয়সা।

ফলে এই নিয়মের পরিণামে দেখা যাচ্ছে, বেকার সংখ্যা বাড়ার ফলে দেশে ক্রমাগত আর্থিক ক্ষমতাহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে যে শ্রমিকরা কেবল বেঁচে থাকার মতো মজুরি পাচ্ছে, তাদের পক্ষে শিল্পপণ্য কেনার চিন্তা স্বপ্নমাত্র। এই পরিস্থিতিতে শিল্পপণ্য কিনবে কারা? আর, খদ্দেরই যদি না থাকে, তবে কাদের কাছে মাল বেচে মালিক মুনাফা করবে? মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ — প্রথমত, যারা মালিক পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে পড়ে, দ্বিতীয়ত, বড় বড় কোম্পানির বিশাল বেতনের চাকুরে অর্থাৎ উচ্চবিত্তবান বা ধনী, তৃতীয়ত যারা এই ব্যবস্থার মধ্যেও একটু ভাল মাইনের চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে, অথবা চুরি-দুর্নীতি-কালোবাজারি করে টাকা করেছে — তারাই হচ্ছে খদ্দের। এদের ভোগের জন্য যেসব পণ্য দরকার, সেটা দেশের মধ্যে উৎপাদন করে হোক, বা আমদানি করে হোক, মালিকরা ও ব্যবসায়ীরা যোগান দেবে। এর জন্য যে ২/৪টা শিল্প হবে, বা ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে, তাকে তো আর দেশের মানুষের স্বার্থে 'শিল্পায়ন' বলা যায় না, দেশের শ্রীবৃদ্ধিও বলা চলে না। ধনীদের বিলাসপণ্যের উৎপাদনই এখন দেশে বাড়ছে, যাকে অনেকে 'কর্পোরেট শিল্পায়ন' বলছেন — যেজন্য মোটরগাড়ির উৎপাদন দেশে বাড়ছে।

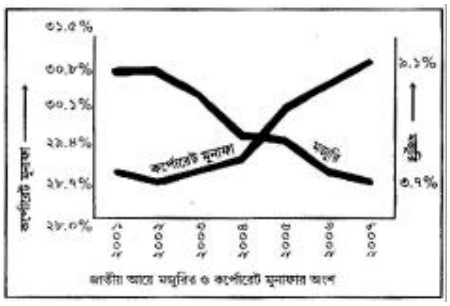

দেশের সম্পদবৃদ্ধি কোন্ খাতে এবং কার পকেটে

ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই যে বৈশিষ্ট্য ও ছবিটা আমরা 'শিল্পায়ন' বিতর্ক প্রসঙ্গে তত্ত্বগতভাবে উপস্থিত করেছি, বাস্তব তথ্যও ক্রমাগত কীভাবে তাকে প্রমাণ করছে, সেটা জানা দরকার। মর্গান স্ট্যানলি হচ্ছে একটি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম। এর কাজ হচ্ছে, বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় অর্থ লগ্নি করা। এই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা গত ৯ জুলাই ইকনমিক টাইমস্ পত্রিকায় একটি নিবন্ধে কিছু তথ্য জানিয়েছেন, যেটা ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার হালহকিকত বুঝতে সাহায্য করে। দেখা যাচ্ছে, গত ৫ বছরে ভারতে জিডিপি বেড়েছে দ্রুত হারে। এই জিডিপি মানে — এক বছরে দেশে নানা ক্ষেত্রে যত উৎপাদন বা আয় হয়, টাকার অঙ্কে তার পরিমাণ। একথা শুনলেই কেউ বলতে পারেন, এই তো উৎপাদন বাড়ছে, তাহলে সঙ্কট কোথায়? আসলে সঙ্কট বুঝতে হলে দেখতে হবে, কোন্ ক্ষেত্রে কী উৎপাদন বাড়ছে, কোন্ ক্ষেত্রে বাড়তি আয় কত সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই বৃদ্ধির সুফল কাদের হাতে যাচ্ছে?

মর্গান স্ট্যানলির হিসাবে গত ৪ বছরে ভারতে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে ১ ট্রিলিয়ন ডলার (মার্কিন হিসাবে ১ এর পিঠে ১২টি শূন্য, বা ১ লক্ষ কোটি ডলার)। অঙ্কটা বিরাট, ভারতের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (অর্থমূল্যে) সমান। এখানে যেটা বিশেষভাবে দেখার, তা হচ্ছে, এই বিপুল সম্পদ কি শিল্প উৎপাদন, বা কৃষি উৎপাদন থেকে সৃষ্টি হল? না, তা নয়। এই সম্পদবৃদ্ধির মুখ্য তিনটি ক্ষেত্র হল: (১) শেয়ারবাজার, (২) জমি-বাড়ি ও (৩) সোনা। শেয়ারবাজারের মাধ্যমে সম্পদবৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে, অপেক্ষাকৃত কম দামে শেয়ার কিনে বেশি দামে বিক্রি করে লাভ করা, যাকে সরল ভাষায় ফাটকা কারবার, বা জুয়া বলা যায়। এখানেও আবার এই বাড়তি সম্পদের ভাগীদার কারা? কাগজে-টিভিতে আজকাল শেয়ারবাজার সমীক্ষা নিয়ে এত প্রচার তোলা হয়, যাতে মনে হবে, দেশের সাধারণ মানুষও বুঝি লাখে লাখে শেয়ারবাজারে গিয়ে শেয়ার কেনাবেচা করে বাড়তি আয় করছে। এত প্রচারের পিছনকার মতলব অবশ্য মানুষকে শেয়ারবাজারে ফাটকা খেলতে প্রলুব্ধ করা, যাতে জুয়ার দ্বারা হলেও কিছু মানুষের হাতে বাড়তি অর্থ আসে, ক্রেতার সংখ্যা কিছু বাড়ে। যাই হোক, শেয়ারবাজারের পরিচালন সংস্থা সেবি-র হিসাবে দেশের মানুষের মাত্র ৪-৭ শতাংশের হাতে শেয়ার আছে। গত ৪ বছরে শেয়ার-হোল্ডারদের আয়বৃদ্ধির পরিমাণ মোট৫৭০ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি টাকা) মালিক হচ্ছে, যেসব কোম্পানি বাজারে শেয়ার ছাড়ে তারাই। অর্থাৎ, শেয়ারের বেশি অংশটা আছে কোম্পানিগুলোর হাতেই। তারাই নানা উপায়ে দাম কমিয়ে-বাড়িয়ে শেয়ার থেকে বাড়তি লাভ ঘরে তোলে। ফলে, শেয়ারবাজারে সম্পদ সৃষ্টি হওয়ার সাথে দেশের সাধারণ মানুষের আয়বৃদ্ধি হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। এখানেও লাভবান মুষ্টিমেয় একটি অংশই।

এরপর আছে জমি-বাড়ি বা রিয়েল এস্টেট। মর্গান স্ট্যানলির হিসাবে গত ৪ বছরে জমি-বাড়ির রিয়েল এস্টেট কারবারে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে ৩০০০ থেকে ৫০০০ কোটি টাকা। এত জমি-বাড়ি কারা কিনল? ওদেরই হিসাবে দেশের মাত্র ৪৭ শতাংশ মানুষ 'পাকা বাড়িতে' বাস করার সুযোগ পায়। এদের মধ্যেও আবার উপরের বিত্তবান অংশই বর্গফুটের হিসাবে বেশি স্থান দখল করে আছে। অর্থাৎ, জমি-বাড়ির ক্রেতাও অধিকাংশই সাধারণ মানুষ নন। এই জমি-বাড়ির রিয়েল এস্টেট ব্যবসা প্রসঙ্গে আমরা পরে আবার আলোচনায় যাব।

তৃতীয় হচ্ছে, সোনাদানায় গচ্ছিত সম্পদ। এর পরিমাণ ২০০৩ সালে ছিল ২০ হাজার কোটি টাকা, সেটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সালের মার্চে দাঁড়িয়েছে ৩৭ হাজার কোটি টাকা। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার হিসাবে ২০০২ সালে সোনা-গয়না সহ স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ৭১ শতাংশ ভোগ দখল করত দেশের ধনীতম ৩৫ শতাংশ মানুষ। বোঝাই যায়, এই বিপুল সোনা-গহনার মালিকও দেশের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী।

এই হচ্ছে দেশে সম্পদবৃদ্ধি ও তার ভাগাভাগির সামান্য নমুনা। এখন শ্রমিকদের মজুরির যেকথা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, তার ছবিটা কেমন। মর্গান স্ট্যানলির হিসাব মতোই ২০০১ সাল থেকে ভারতের জাতীয় আয়ে মজুরির ভাগ ক্রমাগত কমছে। জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয়ের যোগফল দিয়ে। তাতে পুঁজিপতিদের মুনাফাও যেমন থাকে, তেমনি শ্রমিক- কর্মচারীদের মজুরি বাবদ আয়ও থাকে। দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ বছরে জাতীয় আয়ে বড় বড় কোম্পানি ও ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির মুনাফার অনুপাত বেড়েছে। ২০০২ অর্থবর্ষে জাতীয় আয়ে মুনাফার অংশ ছিল ৩.৭ শতাংশ, ২০০৭ সালে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৯.১ শতাংশ। অন্যদিকে মজুরির অনুপাতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, এই একই সময়ে জাতীয় আয়ে মজুরির অংশ কমে গিয়েছে — ২০০১ সালে এটা ছিল ৩১ শতাংশ, ২০০৭ সালে তা কমে হয়েছে ২৮.৭ শতাংশ। এই মজুরি বলতে কোন্ কোন্ অংশের শ্রমিক-কর্মচারীর আয় ধরা হয়েছে — তা জানানো হয়নি। লাখ টাকা মাস মাইনের কর্মচারী বা ম্যানেজারের সাথে যদি ২ হাজার - ৫ হাজার টাকা মাস মাইনের মজুরি শ্রমিককে মিলিয়ে ধরা হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে ফাঁকি আছে। তেমন গড় হিসাবে দেশের অধিকাংশ শ্রমিক-কর্মচারীর করুণ অবস্থার আসল ছবি পাওয়াই যাবে না। এর সাথে যদি দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ, যারা কৃষিকাজে যুক্ত তাদের অবস্থা দেখা যায়, তাহলে দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় শূন্যের কোঠায়।

সাধারণের বরাদ্দ কমছে খাদ্যে, বাড়ছে জ্বালানি-বিদ্যুৎ-পরিবহন ও চিকিৎসায়

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও খুব প্রাসঙ্গিক হবে। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বাড়ছে বলে যখন খুব হৈ চৈ চলছে, তখন কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার ২০০৭ সালে প্রকাশ করা ন্যাশানাল অ্যাকাউন্টস স্ট্যাটিসটিকস্ থেকে দেখা গেল, জিডিপি বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের মানুষের পারিবারিক খরচের মধ্যে খাদ্যে খরচের ভাগ ক্রমাগত কমেছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে যেখানে পরিবারের বার্ষিক খরচের ৪৫.৩ শতাংশই ছিল শুধু খাদ্যের জন্য, সেটা ২০০৫-০৬ সালে কমে হয়েছে মোট খরচের মাত্র ৩৩.৫ শতাংশ। পরিবারের পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য খরচের পরিমাণও কমেছে। দেখা যাচ্ছে, খরচ বেড়েছে বাড়িভাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুতে। খরচ বেড়েছে পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে। সবচাইতে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, জনগণের একটা বড় অংশই পরিবারের খাদ্যের জন্য খরচ কমাতে বাধ্য হচ্ছে অন্যান্য খরচ মেটাবার জন্য। যে কেউ স্বীকার করবেন যে, সাধারণ মানুষের রোজকার খাদ্যের তালিকা ও পরিমাণ কমানো ছাড়া ব্যয় কমানোর অন্য কোনও

ছয়ের পাতায় দেখুন

অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার এত বাড়ছে কেন

তিনের পাতার পর

হস্তান্তরের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিভূ হিসাবে স্বাধীন ভারতের সরকারি ক্ষমতা দখল করে কংগ্রেস।

রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর খুব স্বাভাবিকভাবে ইতিমধ্যেই সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়া এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণী, নিজেদের শাসনশোষণ অবাধে চালাবার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা যাতে গড়ে না ওঠে সেই চেষ্টা চালায়। শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেস ভারত রাষ্ট্রকে একটি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে না তুলে 'ধর্মনিরপেক্ষ' নামের আড়ালে প্রয়োজনমতো সব ধর্মকে উৎসাহ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমস্ত ধরনের ধর্মীয় আচার-আচরণ ও কুসংস্কারের কাছে মাথা নোয়ান। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, পূজাপার্বণে নেতারা সোৎসাহে যোগ দেওয়া শুরু করেন, অনেকেই, 'বাবা' তথা 'গুরুদেব'-দের পাদপদ্মে আশ্রয় নিলেন। ভোটে জিততে বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর মন্দিরে পুজো দেওয়া, এমনকী 'মানতে'র শর্ত হিসাবে মাথার চুল কেটে ফেলতেও পিছ্‌পা হন না অনেকেই। রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে, সরকারি সংস্থা বা প্রকল্পের দ্বারোদ্‌ঘাটনের শুভদিন নির্ধারণে পাঁজি-পুঁথি-তিথি-নক্ষত্রের সাহায্য নেওয়া হতে লাগল, ধর্মীয় আচার-আচরণ পালিত হতে লাগল। শিক্ষায় লাগল কুসংস্কারের ছোঁয়া। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলে জ্যোতিষবিদ্যা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, বর্তমানে সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের আমলে তন্ত্র-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা নিয়ে যথেষ্ট চর্চা চলছে। এইভাবে গোটা দেশজুড়েই চিন্তার জগতে যুক্তিবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়েছে। ফল হিসাবে জীবনে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

বাস্তবে, নিজেদের শোষণ-জুলুম অবাধে চালিয়ে যাওয়ার স্বার্থে শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী কখনই সমাজে যুক্তিবাদের প্রসার হতে দিতে চায় না। অত্যাচারিত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ যাতে তার দুঃখদুর্দশার আসল কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা না করে, যাতে তারা নিজেদের অপরিসীম দুঃখ-দারিদ্র্যকে ভাগ্যের লিখন, অথবা পূর্বজন্মের পাপের ফল হিসাবে মেনে নিয়ে পুঁজিমালিকদের শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করে, সেই মতলব হাসিল করার জন্য পুঁজিপতিশ্রেণী সাধারণ মানুষকে অন্ধতায়, অজ্ঞতায় ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে চায়। ফলে ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণী যে দেশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রসারে বাধা দেবে, মানুষকে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারনির্ভর করে রাখার চেষ্টা চালাবে, সেটাই স্বাভাবিক। পুঁজিপতিশ্রেণীর পেটোয়া দল হিসাবে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও যে পুঁজিমালিকদের এই মতলব হাসিল করতে সাহায্য করবে সেটাও স্বাভাবিক। এই দলগুলির কাছ থেকে এর চেয়ে অন্যরকম কিছু আশা করাই উচিত নয়।

এ বিষয়ে অন্যরকম প্রত্যাশা ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির কাছে। কারণ, যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা যুক্তিহীনতা ও কুসংস্কারের প্রাচীর ভেঙে মানুষকে যুক্তি ও বিজ্ঞানচেতনার খোলা আকাশের নীচে দাঁড় করাতে পারে তারাই, যারা এই পচা-গলা পুঁজিবাদী সমাজকে ভেঙে মানুষের ওপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটাতে চায়। তাই এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার কথা বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিরই। সমাজের নানা অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলা, এই অন্যায়ের মূল কারণ খুঁজবার জন্য তাদের মধ্যে বিজ্ঞান নির্ভর অনুসন্ধিৎসু মন তৈরি করা এবং সেই কাজ করতে করতেই মার্কসবাদের সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটিয়ে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের পিছনে থাকা পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করা — এটাই করার কথা ছিল বামপন্থীদের। সিপিআই ও সিপিএম-এর মতো বৃহৎ বামপন্থী দলগুলির কাছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সেই প্রত্যাশাই ছিল। কিন্তু সেই দায়িত্ব তারা পালন করেনি। সভা-সমিতিতে কুসংস্কার বিরোধী কিছু গরম বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া এই দলগুলির নেতৃত্ব সমাজমননে পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে ব্যাপক আকারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কণামাত্র দায়িত্বও পালন করেননি। কুসংস্কারের মায়াজালে জড়িয়ে রেখে পুঁজিপতিরা কীভাবে নিজেদের খুশিমতো জনগণকে পুতুল নাচ নাচাচ্ছে এবং সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার ন্যূনতম চেষ্টাও তাঁরা করেননি। এটা যে জনগণের পক্ষে অসম্মানজনক, বিজ্ঞানমনস্কতার শক্তিতে যে এর বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর দরকার; দৈবশক্তি নয়, এই শোষণমূলক ব্যবস্থার উচ্ছেদই যে সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তাকে দূর করতে পারে, বৃহৎ বামদল হিসাবে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও তাঁরা এ সত্য তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেননি। শুধু মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা নয়, গায়ের জোরের রাজনীতি করতে গিয়ে দেশ ও দলের মধ্যে যুক্তিতর্কের পরিবেশ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়ে 'বাম' নামধারী এই দলগুলির নেতৃত্ব নিজেদের কর্মীদের মধ্যে অন্ধতা ও উগ্রতার মানসিকতা সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে, রুচি-সংস্কৃতি ও চরিত্রের মান ক্রমাগত উন্নত করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় সংগ্রামে তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেননি। এরই প্রভাব পড়েছে এইসব দলের নেতা-কর্মীদের জীবনযাত্রায়। এঁদের অধিকাংশই নিজেদের জীবনচর্যাতেও কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদের প্রয়োগ করেননি। তাঁদের অনেককেই সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি বিনা দ্বিধায় মান্য করে চলতে দেখা যায়। বিশেষত, বিবাহে অথবা পরিবারের কারোর মৃত্যু হলে, মৃতদেহ দাহ করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিয়ম এবং শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথানিয়মে তাঁদের অধিকাংশ কর্মী-সমর্থকই পালন করে থাকেন। তাই পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশ বছর ধরে সিপিএম-ফ্রন্টের মতো একটি 'বাম' নামধারী ফ্রন্ট সরকারে থাকা সত্ত্বেও গোটা দেশের মতো এখানেও সমাজমননে যুক্তিহীন মানসিকতা ছেয়ে রয়েছে। রয়ে গেছে জাত-পাত ও ধর্মকে ভিত্তি করে মানুষে মানুষে বিভেদ এবং কুসংস্কারের প্রবল দাপট। পুজো-আর্চা এবং নানা ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রাবল্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে পাল্টা স্রোত সৃষ্টি করার চেষ্টার বদলে 'মার্কসবাদী' নামধারী দলগুলির নেতা-নেত্রীদের বহু ক্ষেত্রেই এগুলিতেই উৎসাহ দিতে দেখা যায়। এলাকার পূজামণ্ডপে উদ্বোধনের ফিতে কাটতে অথবা কোনও বিশেষ ধর্মের উৎসবে সেই বিশেষ ধর্মের অনুগামীদের মতো সাজসজ্জা করে তাঁদের সোৎসাহে উপস্থিত হতে দেখা যায়। জীবনাচরণে ধর্মীয় ভাবধারামুক্ত মানসিকতা নিয়ে চলা দূর অস্ত্, বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিছক ভোট পাওয়ার হিসাব কষে এইসব নেতারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নিচ্ছেন।

প্রথমে সামন্ততন্ত্র এবং পরে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কায়েমী স্বার্থবাজ শোষকশ্রেণীর কৌশলে এদেশের সাধারণ মানুষের মজ্জায় মজ্জায় মিশে গিয়েছে অযৌক্তিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবনাধারণা। যুগ যুগ ধরে এই অন্ধতা নিয়ে তারা দিন কাটিয়েছে। পুঁজিবাদের এই চরম অবক্ষয়ের যুগে মানুষ যখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংকটের সম্মুখীন, তখন এই অন্ধতাকে আশ্রয় করেই সে বাঁচতে চাইছে। এই সময়ে সহজে এই মানসিকতা সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষ যদি তার সকল দুর্দশার মূল এই শোষণমূলক পচাগলা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রামে নামে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মেহনতি মানুষ যদি এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে উন্নত সংস্কৃতির আধারে গণআন্দোলন গড়ে তুলে পুঁজিপতিশ্রেণীর নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাহলেই কেবলমাত্র এই লড়াকু মানুষগুলির মধ্যেকার জাতি-বর্ণ-ধর্মের বিদ্বেষ দূর হবে। তারা যেমন বুঝবে, অত্যাচারিত মানুষের কোনও জাতিভেদ হয় না, তারা সকলেই একই লড়াইয়ের সৈনিক ; তেমনই একথাও বুঝবে যে, কোনও গ্রহ-নক্ষত্র নয়, তাদের জীবনের এই চরম দুরবস্থার কারণ শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এর হাত থেকে কোনও কবচ-মাদুলি-আংটি তাদের রক্ষা করতে পারবে না, সঠিক নেতৃত্বে উন্নত সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তুলে তারা নিজেরাই পারে নিজেদের এই দুরবস্থা দূর করতে।

মুম্বই-এ মহান এঙ্গেলস ও শিবদাস ঘোষ স্মরণে সভা

মুম্বই সেন্ট্রালে (পশ্চিম) জনতা কেন্দ্রে মহান নেতা এঙ্গেলসের ১১২ তম এবং শিবদাস ঘোষের ৩২ তম স্মরণ দিবস উপলক্ষে ৫ আগস্ট এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মুম্বই-থানে সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড কুমার কুলশ্রেষ্ঠ। প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায়। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মুম্বই-থানে সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড এ কে ত্যাগী, কমরেড জয়রাম বিশ্বকর্মা। কমরেড রায় বক্তব্যে দুই মহান নেতার জীবন-সংগ্রাম তুলে ধরেন এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে বলেন, শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। তিনি এর বিরুদ্ধে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সামিল হওয়ার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান।

সিইএসসি ভবন ও বিদ্যুৎ ভবনে গ্রাহক বিক্ষোভ

অ্যাবেকার ডাকে ৬ সেপ্টেম্বর সারা রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা একযোগে সিইএসসি-র সদর দপ্তর এবং সল্টলেকে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির সদর দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কলকাতায় গ্রাহকরা কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে ধর্মতলায় মেট্রো সিনেমার সামনে পৌঁছালে পুলিশ বাধা দেয়। প্রতিবাদে গ্রাহকরা চৌরঙ্গী ও লেনিন সরণীর সংযোগস্থলে রাস্তা অবরোধ করে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে ধিক্কার জানায়। কুশপুত্তলিকায় অগ্নি সংযোগ করেন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক অমল মাইতি।

এরপর সিইএসসি ভবনের সামনে বিক্ষোভ-সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, গোয়েঙ্কা পরিচালিত সিইএসসি'র সাথে রাজ্য সরকার এবং বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন মিলে এক চক্র গড়ে তুলেছে। সিইএসসি'র বিপুল মুনাফা ও বৃহৎ শিল্পপতিদের সস্তায় বিদ্যুৎ দেবার জন্য গরিব মধ্যবিত্তদের মাশুল বাড়ানো হচ্ছে এবং লোডশেডিং করা হচ্ছে। লোডশেডিং বন্ধ করে গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ঐ একই সময় সল্টলেকে বিকাশ ভবনের সামনে জমায়েত হয়ে কয়েকহাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক মিছিল করে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে পৌঁছানোর আগেই পুলিশ বাধা দিলে সেখানে প্রবল বিক্ষোভ হয়। অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে এস ই ডি সি এল-এর চেয়ারম্যানের হাতে এবং সাধারণ সম্পাদক অমল মাইতির নেতৃত্বে প্রতিনিধিরা সিইএসসি'র কর্তৃপক্ষের হাতে স্মারকলিপি দেন। দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে তাঁরা জানান।

অ্যাবেকার ধিক্কার সপ্তাহ

বিদ্যুৎবন্টন কোম্পানিগুলির অধিকতর মুনাফার স্বার্থে এবং বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থা-গুলিকে কমদামে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য ক্ষুদ্রশিল্প-বাণিজ্য-গৃহস্থ ও কৃষিতে বিদ্যুৎমাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং বন্যা কবলিত থানাগুলিতে বিদ্যুৎ বিল মকুবের দাবিতে অ্যাবেকার আহ্বানে ১৬-২৩ আগস্ট রাজ্যব্যাপী ধিক্কার সপ্তাহে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক, ময়না, নন্দকুমার, পাঁশকুড়া, কোলাঘাট এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং, পিংলা, বেলদা, বালিচক স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কাঁথি এবং খড়্গপুরের ডিভিশনাল ম্যানেজারের দপ্তরেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

শিক্ষক দিবসে শিক্ষকরা রাজপথে

রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষক বিরোধী নীতির প্রতিবাদে শিক্ষক দিবসের যাবতীয় সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট করে বিপিটিএ-র নেতৃত্বে এসপ্ল্যানেডে সারাদিনব্যাপী শিক্ষকদের অবস্থান আন্দোলন। মঞ্চে নেতৃবৃন্দ।

শিল্পপণ্য কিনবে কারা

চারের পাতার পর

পথই নেই। এই অবস্থার শিল্পপণ্য কিনবে তারা কীসের জোরে? কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও দেশের জিডিপি বা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন আগের তুলনায় বাড়বে। কারণ, মানুষ জ্বালানি, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, পরিবহন ইত্যাদি যে যে খাতে আগের থেকে বেশি খরচ করতে বাধ্য হচ্ছে, সেই সেই ক্ষেত্রে জাতীয় আয় বা উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটেছে — এটাই হিসাবে আসবে। গৃহস্থকে কেরোসিন, গ্যাস, বিদ্যুতের দাম আগের চেয়ে বেশি দিতে হচ্ছে; পরিবহন খরচ, হাসপাতাল-ওষুধের জন্য খরচ বিরাট বেড়েছে — পরিণামে জিডিপি'র হিসাবের প্রশ্নে ঐসব উৎপাদন ক্ষেত্রে আয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে বলে দেখানো হবে। জিডিপি বৃদ্ধির রহস্যটা এমনই।

এই যেখানে দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, সেখানে পুঁজিপতিরা সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্য উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ করবে কেন? এই অবস্থা থেকে বেরোবার জন্য সর্বপ্রথম দরকার, সাধারণ মানুষের আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। সেজন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতি সেটা পারে না। বরং মুনাফা বাড়াবার জন্য পুঁজিপতিরা ক্রমাগত শ্রমিক ছাঁটাই করছে, আধুনিক প্রযুক্তি এনে শ্রমিকের সংখ্যা যত কম করা যায় তার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। কৃষিজমি কেড়ে নিয়ে হাজার হাজার চাষীর জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে, খুচরো ব্যবসা দখল করে কোটি কোটি খুচরো ব্যবসায়ীর রুটি-রুজি ধ্বংস করার পথে যাচ্ছে। এইসব পদক্ষেপের দ্বারা পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু সাথে সাথে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা আরও কমে গিয়ে বাজারের আরও সংকোচন ঘটছে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় আরও সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

উচ্চবিত্ত ও ধনীদের ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদনই বাড়ছে

দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাহীন অবস্থা বাজারে যে ক্রমাগত চাহিদার সমস্যা বাড়িয়ে চলেছে, তাতে এখন উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে উচ্চবিত্ত ও ধনীদের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে। জমি-বাড়ির রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় পুঁজি যাচ্ছে, সেজন্য সিমেন্ট-লোহা-ইট-এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাস্তা-ব্রিজ তৈরি হওয়ার খবরে এমনকী বিদেশি পুঁজিও আসছে এদেশে। এসবকে কেন্দ্র করে যেসব যন্ত্রপাতি বা দ্রব্য প্রয়োজন, সেগুলির উৎপাদন কিছু বাড়তে পারে। এক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার, এই জমি-বাড়ির তৈরির ও তা নিয়ে ব্যবসার কাজে যে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে সেটাও মূলত ঋণনির্ভর, এমনকী শেয়ারবাজারে ফাটকায় খাটছে ঋণের টাকা। প্রোমোটাররা বাড়ি তৈরির জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে। আবার ফ্ল্যাটের ক্রেতারাও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দাম মেটাচ্ছে। জমি-বাড়ির পরিকাঠামো তৈরির রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় এখন বিরাট বিরাট কোম্পানি নেমে পড়ায় ঋণের বাজারও বেড়ে গেছে। এমনকী কিছু কিছু রিয়েল এস্টেটের কারবারি এজন্য বিদেশের বাজার থেকেও ঋণ করছে। এভাবে দেশের অর্থনীতিতে ঋণ করা টাকার পরিমাণ বিপুল হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ধার করে ঘি খাওয়ায় আপত্তি নেই, যদি ধার শোধ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। কিছুদিন আগে আমেরিকায় জমি-বাড়ির ব্যবসায় মন্দা যেভাবে শেয়ারবাজারে ধস নামিয়ে দিল, তা নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করার মতো ঘটনা। আমেরিকার নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ ব্যাংক থেকে দেদার ঋণ নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিল, দলিল মর্টগেজ রাখা ছিল ব্যাংক বা অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থার কাছে। চুক্তিমতো মাসে বা বছরে ঋণ সুদসহ শোধ করার কথা। কিন্তু সেদেশেও সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা এখন এতই খারাপ যে, ঋণ শোধ করতে তারা ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলে ঋণ দেওয়া কোম্পানিগুলোয় লালবাতি জ্বলে গেছে, শেয়ারবাজারে এইসব কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম প্রায় শূন্যে ঠেকেছে, ধস নেমেছে শেয়ারবাজারে, যার ধাক্কা ভারতের শেয়ারবাজারে পড়েছে। ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত ঋণের উপর ভিত্তি করে যে ক্রয়ক্ষমতা, তার উপর নির্ভরশীল হয়ে উৎপাদন চললে বা বৃদ্ধি পেলে, তাতে বাইরে যতই দোকান-বাজার ঝলমলে দেখাক, আসলে অর্থনীতিটা দাঁড়িয়ে থাকে বালির চরের উপর। ভারতের অর্থনীতিরও দশা অনেকটা সেরকমই। আমরা যে ঋণের কথা বলছি, সেটা কিন্তু সরকারের করা ঋণ নয়, এ হল খোলাবাজারের ব্যাংক ও নানা ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ধার করা টাকা — যেটা কৃত্রিম বা ফাঁপা ক্রয়ক্ষমতার সৃষ্টি করছে। সদ্যই এর নমুনা দেখা গেল গাড়ি-বিক্রির বাজারে। অর্থনীতিতে এ ধরনের ঋণের পরিমাণ কমাতে রিজার্ভ ব্যাংকের পরোক্ষ নির্দেশে বিভিন্ন ব্যাংক ঋণের উপর দেয় সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তারপরই টাটা মোটরস্ জানায়, তাদের গাড়ি বিক্রির পরিমাণ ৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। অর্থাৎ মোটর গাড়ির 'তেজি' বাজারটা দাঁড়িয়ে আছে ঋণের উপর। কোনও ব্যক্তি ধার করে ব্যয় মেটাতে গিয়ে শেষে ব্যর্থ হলে আত্মহত্যা করছে এমন সংবাদ এখন প্রায়শই দেখা যায়। চাষীরা তো দলে দলে আত্মহননের পথ নিচ্ছে। কোনও দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এ জিনিস ঘটে অত্যধিক ঋণনির্ভরতা থেকে। অর্থনীতির চাকা পাঁকে পড়ে যায়। কলকারখানা-ব্যবসায় লালবাতি জ্বলে। এজন্য রিজার্ভ ব্যাংক ঋণের উপর লাগাম টানার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু সে ব্যাপারেও সমস্যা। কারণ ঋণ দেওয়া কমিয়ে দিলে বাজারে চাহিদা আরও কমে যাবে। বাজার আরও কমবে, ফলে উৎপাদনে আরও সংকট বৃদ্ধি পাবে। তাই দেখা গেল, একদিকে ব্যাংকগুলিকে দেশের রিজার্ভ ব্যাংক নির্দেশ দিল, প্রয়োজনে সুদের হার বাড়িয়ে বাজারে টাকা কমাও, ঋণ বেশি দিও না; অন্যদিকে দেশের অর্থমন্ত্রী দেশের ব্যাংকগুলির চেয়ারম্যানদের ডেকে বৈঠক করে বললেন, ঋণের উপর সুদ বাড়াবেন না, তাহলে উৎপাদন মার খাবে। এই হচ্ছে ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'শ্যাম রাখি, না কুল রাখি' অবস্থা।

ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই অবস্থায় যেখানে অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, সেখানে শিল্পের লাগাতার বিকাশ বা 'শিল্পায়ন' সম্ভব বলে যারা প্রচার করে, তারা মস্তবড় রাজনৈতিক ঠগ্‌বাজ ছাড়া কিছু নয়। এর দ্বারা সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূলের মতো দলের নেতারা সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে আসলে পুঁজিবাদের সেবা করে। এদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে গদি ও নিজেদের পকেট পূরণ এবং এ দুটোই এই ব্যবস্থায় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা নিশ্চিত করতে পারে বলেই এসব নেতারা পুঁজির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

প্রকৃত মার্কসবাদীরা জনগণের কাছে সত্য গোপন করে না, বরং প্রকৃত সত্য তুলে ধরে জনগণকে শিক্ষিত করে প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণের রাস্তায় পা ফেলতে চায়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা তথা প্রকৃত মার্কসবাদী দল এস ইউ সি আই-এর আদর্শকে পাথেয় করে গণদাবী চলে। তাই আমরা প্রকৃত সত্য জনগণের সামনে তুলে ধরে বলি, আজকের সংকটজর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া সাধারণ মানুষের স্বার্থে শিল্পায়ন, এবং তার মধ্য দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে না। ফলে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামেই জনগণকে আগুয়ান হতে হবে।

বিহারে পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ভাগলপুর তথা রাজ্যের অন্যান্য স্থানে ক্রমবর্ধমান পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৯ আগস্ট পাটনায় বিক্ষোভ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হচ্ছে

বঙ্গোপসাগরে যৌথ মহড়া

একের পাতার পর

পাঁচটি রাষ্ট্রের এত বিশাল নৌমহড়ার প্রয়োজন পড়ল? এর কোনও জবাব নেই।

'ন্যাটো'র পুরো কথাটি হচ্ছে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন। এটি হচ্ছে একটি যুদ্ধ জোট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে নিয়ে আমেরিকার উদ্যোগে ও নেতৃত্বে এই জোট গড়ে তোলা হয়েছিল। এই জোটের পথেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা রয়েছে। তখন এই সামরিক জোট গড়ার পক্ষে প্রচার তোলা হয়েছিল যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন গোটা ইউরোপে জোর করে সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য সামরিক আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা করছে, তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপের এমন একটি সামরিক জোট দরকার। ইতিহাস এই সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে। তাছাড়া, এখন সোভিয়েট ইউনিয়ন নেই, সমাজতান্ত্রিক শিবিরও নেই, তাহলে ন্যাটো-র প্রয়োজন কী? পয়লা নম্বর সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা ধুয়া তুলল, সন্ত্রাসবাদ এখন বিশ্বে প্রধান বিপদ, অতএব তার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চাই, সেজন্য ন্যাটো চাই। এই বলে পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক, বর্তমানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে ন্যাটো-র সদস্য করে নিয়ে ঐসব দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হ'ল। আসল উদ্দেশ্য, পুঁজিবাদী রাশিয়াকে মাথা তুলতে না দেওয়া, তাকে ক্রমাগত মার্কিন সামরিক হুমকির চাপে রাখা। কিন্তু এশিয়ায় কী হবে? ইরাকে আক্রমণ সারা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন বিরোধী যে গণবিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়েছে, ইরান যেভাবে মাথা তুলছে, তাতে শুধু ইজরায়েলকে দিয়ে হবে না, পাকিস্তানকে দিয়ে তো নয়ই। অন্যদিকে চীনে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার পর, চীনের শাসকরা চীনের শ্রমজীবী জনগণকে চরম শোষণ করেই একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে বিশ্ববাজারে মার্কিন আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। জাপান বিপন্ন বোধ করছে। অতএব আমেরিকার পাশে ভারতকে চাই। তাই বেশ কিছুকাল ধরেই মার্কিন কর্তাদের মুখে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রশংসা শোনা যাচ্ছে। এই দু'টি গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে কত মিল, 'বিশ্বশান্তি রক্ষা'র জন্য, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই'য়ের জন্য, ভারত-মার্কিন সামরিক সমঝোতা কত জরুরি — এসব কথাও প্রচার করা হচ্ছে অনেকদিন। আমেরিকার শাসকরা জানে — ভারতের পুঁজিপতিরাও চায় দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত একটা 'বৃহৎ শক্তি' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোক, তাহলে বিভিন্ন দেশের বাজারে ঢোকা ভারতীয় পুঁজির পক্ষে সহজ হবে। এই স্বার্থের মিল থেকেই ভারত-মার্কিন সামরিক মৈত্রী ধীরে ধীরে পাকাপোক্ত জোটে পরিণত হওয়ার দিকে গেছে। এই ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণ বলে যাঁরা ভাবছেন, তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, জার্মানি সহ ইউরোপের বহু সাম্রাজ্যবাদী দেশেই ন্যাটোর নামে মার্কিন সেনা রয়েছে; এশিয়ায় জাপান তো আমেরিকার সাথে সামরিক চুক্তিতে এতটাই আবদ্ধ যে, জাপানের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মার্কিন শাসকদের হাতে তুলে দেওয়া আছে। এর দ্বারা কি জাপান ও জার্মানির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়েছে? বরং সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে তারা আবার মাথা তুলেছে। বঙ্গোপসাগরে যে যুদ্ধ-মহড়া হ'ল তা সারা বিশ্বকে এ কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্যই যে, এশিয়ায় মার্কিন যুদ্ধজোটের শরিক হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ভারতবর্ষ, ভারতকে নিয়েই এশিয়ায় দ্বিতীয় ন্যাটো যুদ্ধজোট গড়ে উঠছে।

এ জিনিস একদিনে হঠাৎ করে ঘটেনি। বিজেপির শাসনের সময় থেকে নির্দিষ্টভাবে শুরু হয়ে কংগ্রেসের গত তিন বছরের শাসনে তা দৃঢ় হয়েছে। এই তিন বছর কংগ্রেসের সাথে গভীর মিত্রতায় রয়েছে সিপিএম। তাদের সমর্থনের উপর টিকে আছে সরকার। গোটা প্রক্রিয়ায় তাদের সম্মতি না থাকলে কংগ্রেসের সাধ্য ছিল না এগোবার।

সিপিএমের পূর্ণ সমর্থনেই যে এমন যুদ্ধ মহড়া চলছে, পশ্চিমবঙ্গের কলাইকুণ্ডায় যৌথ বিমান মহড়ার সময় তা প্রমাণ হয়ে যায়। কংগ্রেস-সিপিএম বোঝাপড়ায় স্থির হয়ে যায় যে, খড়্গপুরের কলাইকুণ্ডা সেনাঘাঁটি থেকে আকাশে যৌথ বিমান মহড়া যেমন হওয়ার তেমনই হবে, আবার সিপিএম-ও পাশের মাঠে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাবে। এই ঘটনা থেকে সিপিএমের লোকদেখানো প্রতিবাদ বোঝাতে 'কলাইকুণ্ডা স্টাইল' কথাটির প্রচলনও হয়ে গেল।

বঙ্গোপসাগরে ভারত-মার্কিন যৌথ মহড়ার বিরুদ্ধে সিপিএমের 'জাঠা' এবং 'প্রতিবাদ'ও ঐ কলাইকুণ্ডা স্টাইলে প্রতিবাদ। জনগণের প্রতি এর চেয়ে বড় প্রতারণা আর কী হতে পারে!

শুধু বন্যাত্রাণ নয়, স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধের দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুরে

বন্যাদুর্গতদের বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধ

বন্যাত্রাণের চিঁড়ে, গুড়, ত্রিপল নয়; স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধের দাবিতে ২৯ আগস্ট পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক, জেলা পরিষদ, সেচ দপ্তরের অধীক্ষক বাস্তুকারের অফিসে বন্যার্ত মানুষেরা বিক্ষোভ দেখায়। জেলাশাসক না থাকায় মিছিল ডি এম অফিসের গেটে পৌঁছালে পুলিশ ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। পরে প্রায় দেড় ঘণ্টা কালেক্টর গেটে পথ অবরোধও করেন তাঁরা। জেলাশাসক ৭ সেপ্টেম্বর কমিটির নেতাদের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়ায় রাস্তা অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। বিক্ষোভের ডাক দেয় মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ কমিটি। তাদের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, সংশোধিত ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান, কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাগুই নদীবেসিন প্রকল্প রূপায়ণ, দুবদা বেসিন স্কিমের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা, কংসাবতী ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া নিয়ন্ত্রণ, জীর্ণ নদীবাঁধ সংস্কার ও নদীগর্ভে জমে থাকা পলি-বালি অপসারণ প্রভৃতি। কমিটির পক্ষ থেকে সেচ দপ্তরের অধীক্ষক বাস্তুকার অসীম মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সেচ কর্মাধ্যক্ষ সমীর হাজরা, জেলা- সম্পাদক (অতিরিক্ত) রামকৃষ্ণ মাইতিকে ১২ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান বলেন, সাম্প্রতিক বর্ষণ ও কংসাবতী, চাণ্ডিল ব্যারেজের ছাড়া জলে দুই মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা একাধিকবার বন্যার কবলে পড়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। হাজার হাজার ঘরবাড়ি নষ্ট হয়েছে। কোটি কোটি টাকার ধান, ফুল, পান, সবজি, মাদুরকাঠি, মাছ চাষের ক্ষতি হয়েছে। মারা গিয়েছে অনেকে। দুই জেলার কয়েক হাজার মৌজাকে 'বন্যা দুর্গত' বলে ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। অথচ পর্যাপ্ত ত্রাণ, পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা নেই। পঞ্চাননবাবুর অভিযোগ, বর্ষার সময় সেচ ও প্রশাসন দপ্তরের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়ানো। বর্ষা চলে গেলে সেই প্রতিশ্রুতিগুলিও বানের জলের সাথে ভেসে যায়।

স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, গত '৮২ সালে সেচদপ্তর ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নিলেও আজও তা লালফিতার ফাঁসে বন্দী। ফলস্বরূপ প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ ফি-বছর সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে গত '৯৪ সালে কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাগুই বেসিন সংস্কারের জন্য স্কিম গ্রহণ করা হলেও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের কাজিয়ায় তা রূপায়িত হয়নি। এর ফলে ১৬ লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত এই বেসিন এলাকায় প্রতি বছর বন্যা লেগে রয়েছে।

কমিটির অফিস সম্পাদক ও কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে অবস্থিত কংসাবতী ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ 'সেচের জন্য ব্যারেজ', এ কারণে বর্ষার শুরুতেই সম্পূর্ণভাবে জল ভর্তি করে রাখার ব্যবস্থা নেয়। এরপর সামান্য বাড়তি বর্ষণ হলেই জল ছাড়া হয়। ফলস্বরূপ ঐ ছাড়া-জল নদীর বহন ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়ে দুই মেদিনীপুর জেলায় বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি করে। '৯৭ সালে কংসাবতী সৃষ্ট বন্যার পর আমরা তৎকালীন সেচমন্ত্রী প্রয়াত গণেশ মণ্ডলকে বর্ষার শুরু থেকে ধাপে ধাপে জল ছেড়ে কংসাবতী ব্যারেজকে খানিকটা খালি রেখে যাতে একসঙ্গে এক লক্ষ কিউসেক জল না ছাড়তে হয় তার দাবি জানাই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী মহোদয় আমাদের ঐ প্রস্তাবের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সেচ সচিব, মুখ্যসচিব, অবসরপ্রাপ্ত একজন মুখ্য বাস্তুকারকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। পরে সেই কমিটির সুপারিশ মত বর্ষার শুরুর সময় থেকে খানিকটা করে জলছাড়া হোত। সম্প্রতি গত কয়েকদিন পূর্বে এক ধাক্কায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়ায় 'কৃত্রিম বন্যা' সৃষ্টি হয়েছে।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন, জেলা কমিটির পক্ষে অমল মাইতি, সূর্য প্রধান, ভূষণ চন্দ্র মণ্ডল, মধুসূদন মান্না, পঞ্চানন প্রধান, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, অঞ্জন জানা প্রমুখ। এছাড়া এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ভানুরতন গুইন।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালডি এলাকায় উঁকা গ্রামনিবাসী কমরেড ভবতোষ দাস ২৫ আগস্ট দীর্ঘ রোগভোগের পর ৭০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি মূলত কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ১৯৬৭ সালে যখন আমাদের দলের বিশিষ্ট সংগঠক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা প্রয়াত কমরেড স্বপন রায়চৌধুরী সাঁওতালডিতে পার্টি ও পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী গড়ে তুলতে কাজ শুরু করেন, তখনই তাঁর সঙ্গে হিন্দুস্থান স্টিল কোল ওয়াশারিজ-এর কর্মী কমরেড ভবতোষ দাসের যোগাযোগ হয়। কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর মাধ্যমে তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং দল ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত হিন্দুস্থান স্টিল কোল ওয়াশারিজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সহসভাপতি ছিলেন। আদর্শপরায়ণতা এবং মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীর কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। বিছানা থেকে ওঠার মত অবস্থা না থাকলেও তিনি অত্যন্ত কষ্ট করে সাঁওতালডিতে কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর স্মরণসভায় যোগ দিয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত থেকেও তিনি দল ও দলের কর্মীদের খোঁজখবর রাখতেন এবং নিয়মিতভাবে দলের পত্রপত্রিকা পড়তেন।

কমরেড ভবতোষ দাস
লাল সেলাম

আন্দোলনের চাপে

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সমস্যা নিয়ে জেপিএ-র সাথে পুনরায় বৈঠকে বসলেন

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারীদের দেশব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২৫ জুলাই ত্রিশ সহস্রাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারীর পার্লামেন্ট অভিযান এবং 'নারী ও শিশু বিকাশ' দপ্তরের বিভাগীয় মন্ত্রী রেণুকা চৌধুরীর নিকট ডেপুটেশনের পরিপ্রেক্ষিতে ২২শে আগস্ট বিভাগীয় মন্ত্রীর সাথে জেপিএ নেতৃত্বের পুনরায় বৈঠক হয়। বৈঠকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারীদের অবিলম্বে বিভাগীয়করণ ও সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা অর্জনের বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। এ ছাড়া ৬ দফা দাবির অন্তর্ভুক্ত আই সি ডি এস-এর পরিকাঠামোর উন্নয়ন, পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ, উপযুক্ত পরিমাণে সুষম ও উন্নত মানের খাদ্য সরবরাহ, বেসরকারীকরণ রোধ, আই সি ও এস-কে এনজিও (NGO) এবং পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখা এবং দুর্নীতিমুক্ত করা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও বিশদ আলোচনা হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারীদের মজুরিবৃদ্ধি সহ কিছু কল্যাণ প্রকল্প শীঘ্রই ঘোষণার প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী। কর্মচারীদের দাবিপত্রের যথার্থতা সম্পর্কে তিনি সহমত প্রকাশ করেন এবং উক্ত সরকারি ঘোষণার অব্যবহিত পরে জেপিএ-র সাথে পুনরায় বৈঠকের প্রতিশ্রুতি দেন।

উল্লেখ্য যে, ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণেও 'অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ'-এর কথা উল্লেখ করেন।

জেপিএ'র সর্বভারতীয় সভাপতি অচিন্ত্য সিনহার নেতৃত্বে এ কে মজুমদার (সাধারণ সম্পাদক জেপিএ), প্রেমচাঁদ (সম্পাদক) এবং অঙ্গনওয়াড়ি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া'র (AEFI) পক্ষে জগমতি মল্লিক (সাধারণ সম্পাদক), পুষ্পা দালাল (সম্পাদক) এবং কৃষ্ণা দাহিয়া (কার্যকরী কমিটির সদস্য) ডেলিগেশনে অংশগ্রহণ করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

গোসাবায় মৎস্যজীবী সম্মেলন

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার উপরে বনদপ্তর, ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং সরকারি মৎস্য নীতির যে আক্রমণ চলছে তার প্রতিবাদে সাউথ সুন্দরবন ও মৎস্যকর্মচারী ইউনিয়নের গোসাবা ব্লক মৎস্যজীবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৯ জুলাই লাহিড়ীপুর অঞ্চলে। প্রবল বর্ষার মধ্যে এই সম্মেলন সফল করার জন্য প্রবীণ মৎস্যজীবী বিশুরাম মণ্ডল ও দিলীপ মণ্ডল অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সম্মেলনে প্রায় ১০০ জন মৎস্যজীবী উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মেলনে বিশ্বেশ্বর গিরিকে আহ্বায়ক করে ৫২ জনের কমিটি গঠিত হয়। এই সম্মেলন গোসাবার বিভিন্ন অঞ্চলে বনকর্মীদের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার জন্য মৎস্যজীবীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।

শহীদ-এ-আজম ভগৎ সিং জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১ সেপ্টেম্বর গুজরাটের সুরাটে বিশাল মিছিল

বীরভূম

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির বিক্ষোভ

বীরভূমের লাভপুরে চিকিৎসার কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে নানা দুর্নীতি। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা রোগীদের অ্যাম্বুলেন্সে পৌঁছে দিতে, সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী যেখানে পাঁচ লিটার ডিজেলের দাম নেওয়ার কথা, সেখানে লাভপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শাসকদলের মদতপুষ্ট 'পল্লীমঙ্গল' নামে একটি এনজিও, সিএমওএইচ-এর দেওয়া অ্যাম্বুলেন্সটি ঐ কাজে ব্যবহার করার বিনিময়ে গরিব রোগীদের কাছ থেকে ৩০০ টাকা ভাড়া আদায় করছে। এছাড়া উত্তম নন্দী নামে স্থানীয় এক পাইকারি ওষুধ ব্যবসায়ী এম ও-দের কাছ থেকে ওষুধের স্যাম্পল সংগ্রহ করে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে বিক্রি করছে। এই সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ করতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি, লাভপুর শাখার উদ্যোগে লালন দাস, জাহাঙ্গীর আলম, নাসরুল শেখ, জাকির হোসেন, মহঃ কেরামত হোসেন, শ্রীকুমার দাস, দয়াময় দাস ও নাড়ু মুর্মু — এই আটজনের একটি প্রতিনিধি দল ১৭ জুলাই ভারপ্রাপ্ত বিএমওএইচ-এর কাছে সম্প্রতি একটি ডেপুটেশন দেন। বিএমওএইচ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন এবং ঐদিনই ব্লক স্বাস্থ্য কমিটির মিটিংয়ের স্থির হয় যে, সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ১৮০ টাকার বিনিময়ে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে যাতায়াত করবে।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

বালুরঘাটে এস ইউ সি আই-এর আইন অমান্যে ব্যাপক লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার

৩১ আগস্ট দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাশাসকের অফিস চত্বরে আইন অমান্য সংগঠিত করা হয়। আইন অমান্যকারীরা অফিসের গেটে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে বিরাট পুলিশবাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় লাঠিচার্জ, আক্রান্ত হন এস ইউ সি আই-এর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সাগর মোদক, আহত হন ২০ জন এস ইউ সি আই কর্মী। কমরেড সাগর মোদক সহ ৪৬ জন আন্দোলনকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশের অমানবিক আচরণে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ এই আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক সমর্থন জানান।

ভোটের বাঁশি

একের পাতার পর

গুজরাটে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় বীভৎস সংখ্যালঘু গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল তখনও মমতা ব্যানার্জী তার বিরুদ্ধে একটি নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহার করেননি, বা তার প্রতিবাদে এন ডি এ ছাড়েননি। ফলে তাঁর ভূমিকার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রতি আন্তরিক বিরোধিতা কখনও ছিল না, আজও নেই। আসলে তিনি ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গে গদি পাওয়ার জন্য হঠাৎ সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। সাথে সাথে এ রাজ্যে ভোটের হিসাব কষে কংগ্রেসের সাথে জোট বাঁধার পথ খুলতে চাইছেন, যেটা এন ডি এ-র সঙ্গ না ছাড়লে সম্ভব নয়। কারণ এটাই কংগ্রেসের শর্ত। কিন্তু মুশকিল হল, আগামী ভোটে জোট রাজনীতির চেহারাটা কী দাঁড়াবে, কংগ্রেস-সিপিএম জোট ভাঙবে না থাকবে, ভোটের ফলাফল কী হবে, পশ্চিমবঙ্গের গদি না হয় কেন্দ্রের মন্ত্রীত্ব— এ দুয়ের মধ্যে কোন শিকেটা ছিঁড়বে— এ সব কিছু এখনই পরিষ্কার নয়। তাই মমতা ব্যানার্জী একই সাথে এন ডি এ জোটের সঙ্গে থাকার রাস্তাটাও খোলা রাখতে চাইছেন। সেইজন্য বিজেপি নেতাদেরও তিনি বোঝাতে চাইছেন, এন ডি এ-তে এখনও তৃণমূল আছে। পাশাপাশি কংগ্রেসের উপর চাপ দিচ্ছেন, যাতে তারা সিপিএমের সঙ্গ ছেড়ে দেয়। এই রাজনীতির মধ্যে জনস্বার্থ রক্ষার স্থান কোথায়? এ তো নির্ভেজাল সুবিধাবাদ।

অন্যদিকে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি নিয়ে কংগ্রেস সিপিএমের মধ্যে যে বিরোধ চলছে এবং উভয়পক্ষ যে রণংদেহি ভাব দেখাচ্ছে, সেটা নিছকই দুই দলের দর কষাকষির খেলা। এই চুক্তিকে সামনে রেখে এক পক্ষ আর এক পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিজ নিজ সুবিধা আদায় করে নিতে চাইছে। এ কথা পরিষ্কার যে, সিপিএমের উপর নির্ভরশীল কেন্দ্রের সরকার আমেরিকার সঙ্গে এমন একটা চুক্তি করতে সাহসই পেত না যদি সিপিএমের থেকে যথার্থ বাধা আসত। কংগ্রেসের কথা থেকেও পরিষ্কার, সমস্ত কিছু সিপিএমের জানার ভিত্তিতেই হয়েছে। আজ সিপিএম নেতারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যে লড়াকু ভাব দেখাচ্ছেন, তার সবটাই লোকদেখানো এবং সেখানেও রয়েছে ভোটের নানা হিসাব। পশ্চিমবঙ্গের সরকারে থেকে সিপিএম নেতাদের মার্কিন পুঁজির ভজনা সৎ কর্মীদের মধ্যে যে সব প্রশ্ন তুলেছে, তাকে চাপা দেওয়া। কেরালায় ঘোর অন্তর্দ্বন্দ্বকে সামাল দেওয়া। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে এতকাল তারা যে সংখ্যলঘু জনগণকে ভোটের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে, তাতে টান পড়ার আশঙ্কায়, মার্কিন বিরোধিতার আওয়াজ তুলে সংখ্যালঘু জনগণের ক্ষোভের মুখকে ঘুরিয়ে দেওয়া। সংবাদে প্রকাশ, সিপিএম সরকার আগামী রাজ্য বাজেটে 'সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে' বরাদ্দ দ্বিগুণ করবে। বলাই বাহুল্য এটাও ভোটের দিকে তাকিয়ে।

কংগ্রেস ভোটে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েই দেশের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম জনগণের জন্য দরদী হয়ে উঠেছে, সাচার কমিটির সুপারিশ দেখিয়ে মুসলিম জনগণের জন্য কী কী আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায় তার হিসেব নিকেশ ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর সঙ্গে জোট বাঁধার চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে দলিত ভোট কব্জা করা যায়। বিজেপি এখন দলের ভিতর কোন্দল সামলাতে ব্যস্ত। সামনে গুজরাট নির্বাচন। সেখানেও অন্তর্দ্বন্দ্ব; ফলাফল নিয়ে সংশয় আছে। তবে সন্দেহ নেই, লোকসভা ভোট যদি হয় তবে যা হোক একটা মন্দির ইস্যু খুঁচিয়ে তুলে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক কবজা করার খেলায় নামবে বিজেপি।

এই হচ্ছে আমাদের দেশের সংসদীয় দলগুলো ও তার নেতা-নেত্রীদের চেহারা। এদের মুখে মুসলিম, দলিত বা তথাকথিত নিম্নবর্গের গরিব মানুষের কথা অথবা মন্দির, হিন্দুত্ব ইত্যাদির নামে জয়ধ্বনি শুনলেই এখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভোট আসছে। এই যাদের চরিত্র, তাদের যে কেউই যদি গদিতে যায় বা সরকার গড়ে, তার দ্বারা জনগণের খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়-শিক্ষার স্বার্থ কখনোই কি রক্ষিত হতে পারে? এরা কোনও দিনই জনস্বার্থ রক্ষা করেনি, কখনও করবেও না। ফলে ভোট আসুক না আসুক, জনগণকে তার স্বার্থ নিজেদেরই রক্ষা করতে হবে এবং তার একমাত্র পথ— সঠিক আদর্শে ও সঠিক নেতৃত্বে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলা। এ ছাড়া জনগণের স্বার্থে অন্য কোনও বিকল্প নেই।

নয়াচরে কেমিকেল হাব

একের পাতার পর

মনুষ্যবাসেরও যথোপযুক্ত স্থান নয়। এসব জায়গায় জোয়ারের গড় সীমারেখা থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে কোন বাড়িঘরই তৈরি করা উচিত নয়। তাহলে দ্বীপটির চওড়ার ৭ কিলোমিটারের মধ্যে ১ কিমিই বাদ দিতে হয়। ঝড়-ঝঞ্ঝা-সাইক্লোন-সুনামি, এমনকী যাঁড়াষাঁড়ির কোটালও যথেষ্ট বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। সমুদ্রতল থেকে সর্বোচ্চ মাত্র ৫ কিংবা ৬ ফুট, আর ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সুনামির উচ্চতা কোথাও কোথাও ৪০ ফুটেরও বেশি ছিল। তাছাড়া বিশ্ব-উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জলের উচ্চতা কম হলেও বাড়ছে, তাই এমনিতেই বিপদ বাড়ছে সমুদ্রতটের ও নিচু জায়গার।

নয়াচর ভাঙাগড়ার কথা ভূগোলবিদ-ভূতাত্ত্বিকরা বেশ ভাল করেই জানেন। প্রস্থ বরাবর পূবদিকে, দৈর্ঘ্য বরাবর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষয়ে গেছে। তাঁরা বলছেন, নয়াচরের স্থায়িত্ব নিয়ে কথা বলার সময় এখনও আসেনি। এমনকী মনুষ্যবসতি তৈরি হলেও দ্বীপভূমির স্বাভাবিক বস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হবে। উদ্ভিজ্জ বিশেষ করে ম্যানগ্রোভ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। ভাবা হচ্ছে, দ্বীপের পূবদিকে, অর্থাৎ যে দিকটায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সে দিকটাতে ও সবদিকে গার্ড-ওয়াল দেওয়া হবে, চারপাশের, বিশেষ করে যেদিকটায় হলদিয়া তথা মেদিনীপুর, সেই চ্যানেল থেকে পলি কেটে উঁচু করে ফেলা হবে দ্বীপটিকে। কিন্তু কেউ কি ভেবেছেন, মাত্র এক ফুট উঁচু করতে কত পলি তুলতে হবে, এখানকার বিশেষ মাটিকে ধরে রাখতে গেলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে, তার জন্য কত খরচ হতে পারে, আর শেষপর্যন্ত কী ফল মিলতে পারে। গার্ড-ওয়াল দিলে দ্বীপভূমির সঞ্চয় ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে ও তার ফলে হয় গার্ড-ওয়াল ভেঙে পড়বে, না-হলে দক্ষিণ ২৪ পরগণার দিকে ভাঙন শুরু হবে। এর সাথে জাহাজ যাতায়াতের এই পথটুকুতেই নদীর পলি নয়াচরের গঠনপ্রক্রিয়ার সুযোগ না পেয়ে নদীগর্ভেই অধঃক্ষিপ্ত হতে থাকবে। একে কলকাতা বন্দরে বহুদিন আগেই বড় বড় জাহাজ যাতায়াতের আর উপায় নেই, হলদিয়া তার বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে, আরও বিপদের সম্ভাবনার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়, অন্যদিকে কার্যত নদীর নাব্যতার বিনিময়ে নয়াচরে এমন ব্যবস্থা নিলে গোটা হলদিয়া-কলকাতা বন্দরেই জাহাজ পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

তাছাড়া আমরা জানি না, প্রস্তাবিত কেমিকেল হাবে কী কী রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হবে, পেট্রোরাসায়নিক শিল্প হলেও 'ডাউনস্ট্রিমে' কী কী তৈরি হবে। আজ এক কথা তো কাল আর এক কথা বলছেন সরকারি প্রতিনিধিরা, এমনকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও। আসলে প্রকৃত সত্যটাই গোপন করছেন তাঁরা। তবে যা-ই তৈরি হোক না কেন, যে বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক বর্জ্যপদার্থ তৈরি হবে (বলাবাহুল্য তার অধিকাংশই পরিবেশ-বান্ধব তো নয়ই, বরং প্রবল বিষাক্ত) তা নদীর জলেই ফেলা হবে। তার অনেকটা চলে যাবে সমুদ্রের দিকে, আর অনেকটা জোয়ার-ভাঁটার ক্রিয়ায় হুগলি নদীর জলে মিশে উত্তর দিকে প্রায় নবদ্বীপ পর্যন্ত চলে আসতে পারে। একদিকে নদীর মোহনা ও সমুদ্রের মাছের মাধ্যমে এই বিষ চলে আসবে মানুষের শরীরে, অন্যদিকে নদীর দুধারের এতগুলি পৌরসভার কয়েক কোটি মানুষ, সাধারণভাবে গ্রাম ও গঞ্জের নদীর জলে নির্ভর করা মানুষ নিশ্চয়ই তার আওতায় পড়বে। যাঁরা সিঙ্গাপুরের ডুরং দ্বীপে কেমিকেল হাবের উদাহরণ টানছেন, তাঁরা ভেবে দেখবেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়াচরে, ডুরং-এ কী ধরনের দূষণ হয়, তার কোনও বিবরণ কিন্তু তাঁরা দেননি (নাকি সেখানে কোনও দূষণ হয় না)। নয়াচরের মতো সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতি-সম্পৃক্ত দ্বীপের সমস্যা কী হতে পারে, সেকথা তাঁরা বুঝতেই পারেননি।

তাই নয়াচরের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, গতিশীল নদী-জল-জোয়ার-ভাঁটা-পলিমাটির সঞ্চয়-ক্ষয়-আবহাওয়া সমন্বিত যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবার এই পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আপাতভাবে দূরবর্তী স্থানের পরিবেশ এবং অবশ্যই কোটি কোটি মানুষের জীবন ইত্যাদির সর্বাঙ্গীন ও সুস্থায়ী কুশল কামনা করলে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে কোনোভাবেই এখানে বা অন্যত্র কেমিকেল হাব স্থাপনের প্রস্তাব দুঃস্বপ্ন মাত্র। অতএব 'লুক বিফোর ইউ লিপ।'

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মালদায় আইনঅমান্য

অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই ৩১ আগস্ট রাজ্যজুড়ে আইনঅমান্য আন্দোলনের যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল, তাতে সামিল হয়ে মালদা জেলা এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে জেলা কালেক্টরেট অফিসের সামনে আইন-অমান্য করা হয়। দুই শতাধিক মানুষের সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে আইনঅমান্য করে গ্রেপ্তারবরণ করে। দলের মালদা জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল নন্দী সহ ৫৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বাকিদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময়ে অগণিত সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনের এই কর্মসূচি তাঁদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in